Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/75	Place of Publication:	Hughly
		Year:	1880 (?)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Budhodaya Jantra by Kashinath Bhattacharya.
Author/ Editor:	Kalimay Ghatak (compiled by)	Size:	10x17.5cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Charitasthak	Remarks:	

চরিতাষ্টক।

প্রথম ভাগ।

—●●○●●—

শ্রীকালীময় ঘটক কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

—●●—

হুগলী।

বুধোদয় যন্ত্রে।

—●●●—

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রথম বার মুদ্রিত।

—●—

মূল্য [illegible]।

সূচি।

—০০০—

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়	১—১৪
২—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	১৫—৩৯
৩—ভারতচন্দ্র রায়	৪০—৫৪
৪—কৃষ্ণপান্তী	৫৫—৮৩
৫—রাজা রামমোহন রায়	৮৪—১১৫
৬—পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়	১১৬—১৩৭
৭—মতিলাল শীল	১৩৮—১৫৪
৮—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫৫—১৮৪

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	২০	বরাহ এবং মিহির	বরাহমিহির এবং বরকচি

নিবেদন।

—•◦•—

পরমার্চ্চনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়

শ্রীচরণেষু।—

আর্য্য,—

সুত কৃত সৎকার্য্য সন্দর্শনে সুখী হওয়া যদি পিতার প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়;—যদি তরুকে কুসুমিত ও ফলিত দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়া রোপনকারীর অপরিহার্য্য হয়; তবে আমার চরিতাষ্টক দেখিয়া আপনি অবশ্যই প্রীত হইবেন এবং তন্নিমিত্তই উহাকে ত্বদীয় নামে অলঙ্কৃত করিতে সাহসী হইলাম।

আপনার আদেশেই এ দেশীয় প্রধান ব্যক্তির জীবন-চরিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই;—প্রায় ষোল জনের জীবনী সংগৃহীত হইলেও আপাততঃ আট জনের মাত্র প্রকাশিত

BLOCKED INFORMATION.

হইল ; কিন্তু আপনার অভিপ্রায়ের কতদূর
আমার দ্বারা সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি
না। তবে এই মাত্র বক্তব্য ; যত্ন ও শ্র
করিতে ত্রুটি করি নাই। এদেশের বিগত
কয়েক শতাব্দীর অন্তর্গত ব্যক্তি বিশেষে
জীবন-চরিত সংগ্রহ করা যে কত কঠিন
আপনি তাহা সম্যক্ অবগত আছেন; এস্থলে
তৎসম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ অনাবশ্যক

আপনিই, বহরমপুর ট্রেনিং বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লোহারাম
শিরোরত্ন মহাশয়কে ইহার পাণ্ডুলিপি দে
খিতে অনুরোধ করেন। তিনিও যত্ন সহ
কারে উহা আদ্যোপান্ত পাঠ ও সংশোধন
করিয়াছেন। অতএব চরিতাষ্টক দ্বারা যদি
কিছু কার্য্য হয়, আপনিই তাহার নেতা।

রাণাঘাট।
৯ ফাল্গুণ। ১২৭৪।

বাৎসল্যাকাঙ্ক্ষি-ছাত্র
শ্রীকালীময় ঘটক।

চরিতাষ্টক।

প্রথম ভাগ।

রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়।

ইনি নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর অধিকার
সময়ে ১১১২ সালে কৃষ্ণ নগরে জন্মগ্রহণ
করিয়া ন্যূনাধিক ৮৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।
ইহাঁর পিতার নাম রাজা রঘুরাম রায়।
যশোহরের অন্তর্গত হাবিলি পরগণার কাঁকদি
গ্রামে ইহাঁদের পূর্ব্ব নিবাস। সম্রাট্ আক-
বর সাহের সময়ে ঢাকার নবাবের উপদ্রবে

BLOCKED INFORMATION.

কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ কাশীনাথ রায় জন্মভূমি কাঁকদি ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া নদীয়া জিলার বাগোয়ান পরগণার বল্লভপুর গ্রামে, ঐ পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। কাশীনাথের পৌত্র ভবানন্দ রায়, বাঙ্গালার নবাব মানসিংহ ও সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের অনুগ্রহে বাগোয়ান প্রভৃতি কয়েক পরগণার জমিদারী পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোপাল রায় রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। পরে নানা উপায়ে আরও উন্নতি হওয়াতে রাজা রঘুরামের সময়ে এই বংশ বঙ্গ দেশের মধ্যে মহা সম্ভ্রান্ত এবং রঘুরাম সর্ব্ব প্রধান রাজা হইয়াছিলেন।

ছেলে হইল না ছেলে হইল না করিয়া রঘুরামের শেষ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য, সন্তান ছিল না, এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে লক্ষণাক্রান্ত পুত্র লাভ করিয়া রাজা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। প্রথম পুত্র হইলে সম্পন্ন ব্যক্তিরা যেমন

ধুম ধাম করিয়া থাকেন, রাজা রঘুরাম তাহা করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মে প্রজা লোকের অতিশয় আনন্দ ও উপকার হইয়াছিল। রাজ কুমার শিক্ষা-যোগ্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত রঘুরাম রায় নানাশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কিছুরই অপ্রতুল ছিল না; সুতরাং সন্তানকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য যতদূর যত্ন করিতে হয় তিনি সমুদায়ই করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও, অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার প্রভাবে অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। রাজকুমারদিগের যে সকল নীতি শিক্ষা আবশ্যক, তাহা উত্তমরূপে শিখিলেন। অস্ত্র বিদ্যাও কম শিখেন নাই; শুনিতে পাওয়া যায় মৃগয়া কালে প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্যাঘ্রাদির ভ্রূর মধ্য স্থলে শর বিদ্ধ করিতে পারিতেন। মুজঃফার হুসেন্ নামক একজন মুসলমান, তাঁহাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি লেখা পড়া শিখিয়া যেমন

সৎ ও বিনীত হইয়াছিলেন, রাজার ঘরে প্রা[য়] তেমন হয় না।

ক্রমে পুত্রকে প্রাপ্ত-বয়স্ক দেখিয়া রঘুরাম রায় তাঁহার বিবাহ দিলেন, এই বিবাহে যে, কত সমৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। অনন্তর তাঁহার হাতে রাজ্য দিয়া রঘুরাম শেষাবস্থায় আপন বংশের রীত্যনুসারে বিষয়-বিরত হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বেই কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভদ্রতা সকলে জানিয়াছিল, এখন তিনি রাজা হওয়াতে প্রজাগণ পরম সুখী হইল।

যুবরাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুরুতর শ্রম ও উৎসাহের সহিত দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করিতে লাগিলেন। আত্ম-সুখে মোহিত না হইয়া কি রূপে প্রজাগণ সুখী হইবে কেবল তাহারই চেষ্টা করিতেন এবং ভাবিতেন "আমার হাতে দুই প্রকার ক্ষমতা আছে, লোকের ভাল করিতে পারি, মন্দ করিতেও পারি। কিন্তু চেষ্টা করিলেই যেখানে মন্দ

করা যাইতে পারে সেখানে মন্দ না করিয়া কেবল ভাল করাই মনুষ্যত্ব।" কি ছোট কি বড় সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। তিনি বিচার কালে নাম, সম্ভ্রম, পদ, বংশ বা ধনের গৌরব করিতেন না। কোন কার্য্যে, প্রবৃত্ত হইলেও, তাহা যদি আপাততঃ প্রজাগণের ক্লেশকর হইত সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিতেন। তিনি বড় ছিলেন বলিয়া কাহার ভয়ের পাত্র ছিলেন না বরং সকলেরই আনন্দ ও আশ্বাসের স্থল ছিলেন। সংক্ষেপতঃ ন্যায়-পথে দাঁড়াইয়া রাজ্য পালন করাই, কৃষ্ণচন্দ্র আপন প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিতেন। অধিক কি! তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া আপনাদিগকে রাম-রাজ্যের প্রজা বলিয়া প্রজাদিগের মনে অভিমান হইত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্বান ও গুণ গ্রাহী ছিলেন। এজন্য তাঁহার রাজ সভায় সর্ব্বদা বড়২ পণ্ডিতের সমাগম হইত। ১১৫৯ সালে বঙ্গ কবি ভারতচন্দ্রকে ফরাস ডাঙ্গা

হইতে আনিয়া সভাসদ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর কয় জন সভাসদের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ রাম প্রসাদ সেন এবং প্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কবি, শরণ তর্কালঙ্কার, ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, এবং অনুকূল বাচস্পতি জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও কএক জন বঙ্গভাষার কবি তাঁহার সভায় থাকিতেন। জ্ঞান হীন তোষামোদী লোকেরা তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না। সজ্জনের সহবাস ও বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগে অবকাশ কাল অতিবাহিত করিতেন। অনেকে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের (১) সভার সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের সভার তুলনা করেন।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন ক্ষত্রিয় রাজগণ যেমন অমিত অর্থ ব্যয় করিয়া বিবিধ যজ্ঞ

(১) নয় জন বিখ্যাত পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। এই জন্য তাঁহার সভাকে নবরত্নের সভা কহিত। পণ্ডিতগণের নাম ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ এবং মিহির।

করিতেন, কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহাদিগের অনুগামী হইতে যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি একদিন মন্ত্রীকে কোন রূপ যজ্ঞের আয়োজন করিতে কহিলেন। মন্ত্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকাইয়া প্রথমে অগ্নিহোত্র পরে বাজপেয় এই উভয় বিধ যজ্ঞের ব্যবস্থা লইয়া তাহার আয়োজন করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যথাক্রমে এই দুই যজ্ঞ সম্পন্ন করায় স্বদেশীয়দিগের নিকট "অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র" এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে কত ব্যয় হইয়াছিল এবং কত দেশের কত লোক আসিয়াছিল তাহার সংখ্যা করা ভার। ইহা প্রকৃত সৎকর্ম্ম কি না—এত ব্যয় ও আড়ম্বরে উহা সম্পন্ন করিবার আবশ্যকতা আছে কি না—ঐ টাকায় উহাপেক্ষা অধিকতর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে কি না আমরা এস্থলে তাহা বলিতে চাহি না।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেমন বড় শ্রেণীর লোক ছিলেন, তেমনি বড়২ কার্য্য দ্বারা দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তিনি এক দিন মৃগয়ানুরোধে চূর্ণি নদীর পূর্ব্ব ধারে এক স্থানে উপস্থিত হন। ঐ স্থান তাঁহার অতি মনোহর বোধ হওয়াতে তথায় এক রাজভবন প্রস্তুত এবং তাহার অপর তিন দিকে উক্ত নদীর সহিত সংলগ্ন করিয়া অতি প্রশস্ত পরিখা খনন করিয়াছিলেন। উভয় দিকে নদীর সহিত মিলিত পরিখা, পুরীকে কঙ্কণাকারে বেষ্টিত করিয়াছিল বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উহার নাম কঙ্কণা এবং তথায় বিস্তর শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া ঐ পুরীর নাম শিব নিবাস রাখেন। এক্ষণে যে শিব-নিবাসের নাম শুনাযায় সে ঐ স্থান। কিন্তু এক্ষণে তাহার পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্যের কোন লক্ষণ নাই। কেবল কএকটী ভগ্নপ্রায় দেবমন্দির আদি আছে। যাহা হউক, কোন সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরিজন ও ভৃত্যবর্গ লইয়া শিব নিবাসে পরম সুখে বাস করিতেছিলেন। এক দিন মধ্যাহ্নকালে দ্বারবান রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া কহিল, মুরশিদাবাদের নবাব

বাড়ী হইতে পত্র লইয়া এক দূত আসিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র তৎকালের মুসলমান শাসনকর্ত্তা সিরাজ উদ্দৌলার নাম মনে পড়াতে কৃষ্ণচন্দ্রের মনঃভীত ও শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। যেহেতু ঐ পামর সেই-সময়ে দেশ উচ্ছিন্ন করিতে বসিয়াছিল; কখন কি করে এই চিন্তায় তিনি সতত শঙ্কিত থাকিতেন। দ্বারীকে কহিলেন "তুমি দূতকে বিশ্রাম করিতে কহিয়া পত্র লইয়া আইস।"

প্রতিহারী পত্র আনিয়া রাজার হস্তে দিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ সভা হইতে উঠিয়া এক নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করত পত্রিকার্থ অবগত হইয়া এককালে হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই পত্রে নবাবকে পদচ্যুত করিবার কথা লেখা ছিল। রাজা সেই দিন নিশীথ সময়ে এক নিভৃত স্থানে মন্ত্রী কালী প্রসাদ সিংহ ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্য গণকে অহ্বান করিয়া পত্র পাঠপূর্ব্বক তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ

এইরূপ,—"স্বভাবতঃ উদ্ধত অবিবেচকও গর্ব্বিত সিরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইয়া যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, বোধ করি আপনি জানিতে পারিতেছেন, কিন্তু রাজধানীতে বাস করিতেছি বলিয়া আমরা যাদৃশ উত্যক্ত হইয়াছি আপনি সেরূপ হন নাই। মহাত্মা মুর্শিদ কুলী ও আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদের যেরূপ সুখ ও সৌভাগ্য ছিল এখন তাহার কিছুই নাই! পূর্ব্বে যেখানে আনন্দ, উৎসাহ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত, এখন সেই স্থান বিপন্নগণের হাহা কারে আকুল হইয়াছে! হায়! নরাকার পিশাচ সিরাজ উদ্দৌলার রাজ্যে বাস করিয়া সতীর সতীত্ব, ধনীর ধন, মানীর মান ও গর্ভিণীর গর্ভ বিপদের কারণ হইয়াছে!! কি দুঃখের বিষয়! মুরসিদা বাদের লোক সকল স্বস্ব ঘর দ্বার ত্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্যত। নবাব কাহারও কোন কথা শুনেন না। যাহা হউক, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া

আপনাকে আহ্বান করিতেছি,—আপনি শীঘ্র আসিবেন।" মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ, মুরসিদাবাদের প্রধান লোকদিগের লিখিত ঐ পত্র শ্রবণ করিয়া রাজাকে তথায় যাইতে পরামর্শ দিলেন।

অনন্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উপযুক্ত সময়ে মুরসিদাবাদে গমন করিয়া সেঠ বংশীয় কোন প্রধান লোক ও রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ প্রভৃতি তত্রত্য প্রধানং লোকদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এবং বর্ত্তমান কালে বিদ্যা, ধন ও সভ্যতায় যাঁহারা ভুবনের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন ও যাঁহারা, প্রজাদিগের হিতসাধনই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা তাহার উদ্যোগ করিতেছেন, অনেক কথার পর, সেই ইংরাজদিগের হস্তে বঙ্গদেশ সমর্পণ করিতে চক্রান্তকারিদিগকে উপদেশ দিলেন। তাহাতেই সিরাজ উদ্দৌলার পতন ও বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হইল। অতএব দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান নবাবের নৃশংস হস্ত হইতে

এইরূপ,—"স্বভাবতঃ উদ্ধত অবিবেচকও গর্ব্বিত সিরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইয়া যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, বোধ করি আপনি জানিতে পারিতেছেন, কিন্তু রাজধানীতে বাস করিতেছি বলিয়া আমরা যাদৃশ উত্যক্ত হইয়াছি আপনি সেরূপ হন নাই। মহাত্মা মুর্শিদ কুলী ও আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদের যেরূপ সুখ ও সৌভাগ্য ছিল এখন তাহার কিছুই নাই! পূর্ব্বে যেখানে আনন্দ, উৎসাহ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত, এখন সেই স্থান বিপন্নগণের হাহা কারে আকুল হইয়াছে! হায়! নরাকার পিশাচ সিরাজ উদ্দৌলার রাজ্যে বাস করিয়া সতীর সতীত্ব, ধনীর ধন, মানীর মান ও গর্ভিণীর গর্ভ বিপদের কারণ হইয়াছে!! কি দুঃখের বিষয়! মুরসিদা বাদের লোক সকল স্বস্ব ঘর দ্বার ত্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্যত। নবাব কাহারও কোন কথা শুনেন না। যাহা হউক, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া

আপনাকে আহ্বান করিতেছি,—আপনি শীঘ্র আসিবেন।" মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ, মুরসিদাবাদের প্রধান লোকদিগের লিখিত ঐ পত্র শ্রবণ করিয়া রাজাকে তথায় যাইতে পরামর্শ দিলেন।

অনন্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উপযুক্ত সময়ে মুরসিদাবাদে গমন করিয়া সেঠ বংশীয় কোন প্রধান লোক ও রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ প্রভৃতি তত্রত্য প্রধানং লোকদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এবং বর্ত্তমান কালে বিদ্যা, ধন ও সভ্যতায় যাঁহারা ভুবনের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন ও যাঁহারা, প্রজাদিগের হিতসাধনই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা তাহার উদ্যোগ করিতেছেন, অনেক কথার পর, সেই ইংরাজদিগের হস্তে বঙ্গদেশ সমর্পণ করিতে চক্রান্তকারিদিগকে উপদেশ দিলেন। তাহাতেই সিরাজ উদ্দৌলার পতন ও বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হইল। অতএব দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান নবাবের নৃশংস হস্ত হইতে

তৎকালীন প্রজাগণের নিষ্কৃতি ও বাঙ্গালার উপস্থিত সৌভাগ্য এ উভয়ই মহাত্মা কৃষ্ণ চন্দ্রের বিবেচনার ফল বলিতে হইবে। একারণ ইংরাজেরা তাঁহার অতিশয় সম্মান করিতেন এবং তাঁহাকে 'রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা শুনা যায়, তন্মধ্যে একটী মাত্র নিম্নে সঙ্কলিত হইল। একদা তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্ত, কোন পিপুণ শিল্পী ঝটিকা কালীন প্রকৃতির চিত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করে। রাজা ঐ চিত্র, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত, নিরীক্ষণ করিয়া পারিতোষিকের জন্য এক টাকা এবং পাথেয় ব্যয়ের জন্য এক শত টাকা চিত্রকরকে দিতে কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন। সভাসদগণ এই অসঙ্গত আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—যে ব্যক্তি উড্ডীয়মান বৎশ পত্রকে নিম্নাভিমুখে করিয়া চিত্র করে, এক টাকাই, তাদৃশ বিষয়

জ্ঞান বিহীন চিত্রকরের সমুচিত পারিতোষিক; তবে চিত্রখানিতে অধিক পরিশ্রম করিয়াছে বলিয়া পথ খরচ কিছু দেওয়া গেল। চিত্র কর মনে করিয়াছিল রাজা তাহার চিত্র-স্থিত তাদৃশ কৌশল ধরিতে পারিবেন না, সুতরাং তাঁহাকে অপ্রতিভ করা সহজ হইবে। এক্ষণে তাহার বিপরীত দেখিয়া রাজার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

১১৯৭ সালে মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি অতি উত্তম লোক ছিলেন। দুঃখীর দুঃখ দেখিতে পারিতেন না; যেরূপেই হউক তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ব্যয় ছিল। পথ, ঘাট, পান্থনিবাস, সরোবর প্রভৃতি সাধারণের হিত জনক বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অর্থ ব্যয় দ্বারা বিদ্যা ব্যবসায়িদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন। অধ্যাপনার্থ অনেক অধ্যাপককে টোল ও বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত লো-

ককে প্রতিপালন করিতেন এবং পণ্ডিত গণের সহিত সর্ব্বদা শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার সভা, পণ্ডিত গণের আরাম স্থল ছিল। হিন্দুধর্ম্মেরপ্রতি যৎপরোনাস্তি ভক্তি ও বিশ্বাস থাকাতে সর্ব্বদাই শাস্ত্রানুসারে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু অনেকে কহেন তাঁহার চরিত্রের কোন২ অংশে দোষ ছিল। আমরাও সে কথায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারিনা। যে হেতু তাঁহার শেষাবস্থার একটী কার্য্য ঐ লোকাপবাদের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে। তিনি অন্যান্য পুত্রদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র শিব চন্দ্র রায়কেই সমস্ত রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন। বয়স অধিক হইলে ভ্রমও হইতে পারে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

—•০•—

ইনি, প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রামে ১১০২-সালে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রুদ্র দেব তর্কবাগীশ। যখন জগন্নাথের জন্ম হয় তখন তাঁহার বয়ক্রম ছ-ষষ্টি বৎসর হইয়াছিল। রুদ্র-দেব সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ঐ শাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, ঐ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কিছু মাত্র সঙ্গতি ছিলনা; কর্ম্মকাণ্ডের নিমন্ত্রণ ও শিষ্য যজমানের দ্বারা যাহা কিছু লাভ হইত তাহাতেই কোন রূপে বহুপরিবারের ভরণ পোষণ করিতেন। তিনি অনপত্যতা ও দরিদ্রতা নিবন্ধন বহুদিন যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়া শেষ অবস্থায়, দগ্ধ তরুর ফলের ন্যায় এক-পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন।

ক্রমে পুত্রের নাম করণের সময় উপস্থিত হইলে শ্বশুরের ইচ্ছানুসারে বালকের নাম জগন্নাথ রাখা হইল। এই রূপ একটী প্রবাদ আছে যে, শৈশবাবস্থায় রুদ্রদেবের এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন সন্তান হইবে, কোন ভবিষ্যদ্বক্তার মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব ব্রহ্মচারী সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে আপন বালিকা কন্যা প্রদান করেন এবং সেই কন্যার পুত্র কামনায় পুরুষোত্তমে গমন করিয়া পুরশ্চরণাদি নানা দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। কিছু দিন পরে এই প্রত্যাদেশ হয় যে,—"তোমার কন্যার গর্ভে এক নর রত্নের জন্ম হইবে, তুমি গৃহে গমন কর—শিশুর নাম জগন্নাথ রাখিও।" এই নিমিত্ত তিনি দৌহিত্রের নাম জগন্নাথ রাখিলেন।

জগন্নাথ বাল্যকালে অতিশয় দুঃশীল ছিলেন। যে বালক শৈশবে অত্যন্ত দুষ্ট হয়, অনেকে তাহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া থাকেন। ফলতঃ একথা নিতান্ত অসঙ্গতও বোধ হয় না। বিশেষতঃ জগন্নাথের স্বভাব

ইহার পক্ষে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি বালক কালে যেমন দুষ্ট ছিলেন—বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তেমনই অসামান্য বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করেন। বুদ্ধিমান হইলেই যে দুষ্ট হইতে হইবে এমন নয়, বালক অশান্ত ও দুষ্ট হইবার অপর কতক গুলি কারণও আছে। জগন্নাথের পক্ষে সে সমুদায়ই ঘটিয়াছিল। একেত বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া পিতা বিলক্ষণ আদর দিতেন, তাহাতে আবার ৮ বৎসরের সময় জননীর মৃত্যু হওয়াতে জগন্নাথ মাতৃহীন হইয়া পড়িলেন। মাতৃহীন শিশুরা প্রায়ই অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়া যার পরনাই আদুরে হইয়া পড়ে তাহা কেনা জানেন? এইরূপ আদরের সহিত যে দুষ্টতা আসিয়া জুটে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তিনি, কটুবাক্য প্রয়োগ ও প্রহার করিতেং পথিকগণের পশ্চাৎং ধাবমান হইতেন, ডেলা দ্বারা নারীদিগের কলসী ভাঙ্গিয়া উচ্চরবে হাস্য ও নৃত্য করিতেন,

গাছে উঠিয়া পত্রের অন্তরালে থাকিয়া নীচের লোকদিগেরে গাত্রে প্রস্রাব ও মল ত্যাগ করিতেন, এবং সর্ব্বদাই কলহ বিবাদ মারামারি ও চুরিদ্বারা লোক সকলকে বিরক্ত করিতেন। তিনি এরূপ দুষ্ট ছিলেন যে, কোন সময়ে বাঁশবেড়িয়ার পঞ্চানন ঠাকুরের পাণ্ডার কাছে একটী পাঁটা চাহিয়াছিলেন; পাণ্ডা তাহা না দেওয়াতে, জগন্নাথ রাগ করিয়া ঐ ঠাকুরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি অপহরণ করত কোন পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন! দুষ্টতা নিবন্ধন জগন্নাথ বাল্য কালেই এক প্রকার বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সুতরাং নিকটস্থ গ্রাম সকলের লোকেরা তাঁহাকে চিনিতেন। ঠাকুর চুরি গেলে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা জগন্নাথেরই কর্ম্ম! যাহা ইউক পরে, পাণ্ডারা তাঁহাকে বৎসরই একটা করিয়া পাঁটা দিবে স্বীকার করিলে জল মধ্য হইতে ঠাকুর উঠাইয়া দেন। অনুক্ষণ এইরূপ ও অপর প্রকার বিবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। এই

সময়ে তাঁহার এক মাতৃষসা তাঁহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় রুদ্রদেব তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ব্যাকরণ ও অভিধান মুখেং শিখাইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ২।৩ খানি সাহিত্য-ও পড়াইলেন। জগন্নাথ আপনার অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা শক্তি প্রভাবে ঐ সকল গ্রন্থ অতি আশ্চর্য্যরূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। একদিন কয়েক জন প্রতি বেশী তাঁহার দৌরাত্ম্যে উত্যক্ত হইয়া রুদ্রদেবের নিকট অভিযোগ করিলেন। তিনি ইহাতে রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া যথোচিত তিরস্কার করত কহিলেন,—"জগন্নাথ তুমি নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত ও লেখা পড়ায় অনাবিষ্ট বোধ হয়, তুমি আমাকে নানা প্রকারে অসুখী করিবার নিমিত্তই আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ভাল! পুস্তক আন—কি শিখিয়াছ দেখি!" জগন্নাথ সত্বর পুঁথি আনিয়

কহিলেন;—"আমি যাহা পড়িয়াছি তাহাই বলিব—না যাহা কল্য পড়িব তাহা বলিব?" ইহা শুনিয়া পিতা বিস্মিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—"ভাল! জগন্নাথ, কল্য যাহা পড়িবে, তাহা কি বলিতে পার?" জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ পুঁথি খুলিয়া পূর্ব্ব-পাঠিতের ন্যায় অপঠিত পাঠ আবৃত্তি করিলেন। পুত্রের এইরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া পিতার আনন্দের সীমা রহিল না।

জগন্নাথ বালক কালে অতিশয় 'আবদারী' ছিলেন। যাহা ধরিতেন কোন রূপেই ছাড়িতেন না। যতক্ষণ অভিলষিত বস্তু না পাইবেন কেবল জননীকে গালি দিতেন মারিতেন ও নানাপ্রকার উপদ্রব করিতেন। কিন্তু প্রার্থিত বস্তু পাইলেই সব ভাল হইয়া যাইত, মনে আহ্লাদ ধরিত না।

তিনি, পিতার নিকট ব্যাকরণ অভিধান প্রভৃতি প্রথম পাঠ্য পুস্তক সকল সমাপ্ত করিয়া, জ্যেষ্ঠভাত ভবদেব ন্যায়লঙ্কারের

বংশবাটী স্থিত টোলে স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিনের মধ্যে এই শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন এই শাস্ত্রে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, তিনি যখন এই শাস্ত্রের যথোপযুক্ত বিচার করিতে পারিতেন, তিনি যখন এই শাস্ত্র বিলোড়ন করিয়া দুরূহ ব্যবস্থা সকল প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র!!

ইহার কিছুকাল পরে ১১১৬সালে রুদ্রদেব মেড়ে গ্রাম নিবাসিনী এক সুলক্ষণা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। তখন জগন্নাথের বয়স চৌদ্দ বৎসর। পিতা মাতা বৃদ্ধ ও সন্ততি বৎসল হইলে সন্তানগণের প্রায়ই বাল্য বিবাহ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, অনন্তর তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। ন্যায়শাস্ত্র অতীব দুরূহ। বিচারাদি করা দূরে থাকুক, অনেকে উহা বুঝিতেও পারে না। কিন্তু জগন্নাথ অসাধারণ প্রতিভা প্রভাবে এবং

অসামান্য শ্রম ও যত্নবলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এমন কি অধ্যয়ন আরম্ভের এক বৎসর পরেই ন্যায়শাস্ত্রের বিচার দ্বারা নবদ্বীপের এক জন বিখ্যাত প্রাচীন পণ্ডিতকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তটী মনোরম বোধ হওয়াতে নিম্নে বিশেষ রূপে লিখিত হইল।

কামালপুর নিবাসী রঘুদেব বাচস্পতি নামক এক জন নৈয়ায়িক ত্রিবেণীতে টোল করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। জগন্নাথও ঐ টোলে পড়িতেন। এক দিন রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ নামক এক পণ্ডিত রঘুদেবের টোলে আসিয়া অতিথি হইলেন। যিনি নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিরতিশয় পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা নানা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যিনি সুকঠিন ন্যায় শাস্ত্রের টীকা করিয়া বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, রমাবল্লভ সেই মহা মহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কারের পৌত্র। ইনি রঘুদেবের

টোলে পদার্পণ করিয়াই মহাদর্পে বিচার আরম্ভ করিলেন, বিবিধ তর্ক দ্বারা অধ্যাপকের সহিত সমস্ত ছাত্রকে পরাজিত করিলেন। অবশেষে টোলের সকলেই বিচারে পরাস্ত হইল বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন! জগন্নাথ ইহার কিছুই জানেন না, তিনি তখন আহার করিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। টোলে আসিয়া শুনিলেন রমাবল্লভ আতিথ্য গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তখনই তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলেন। যাইতে২ ত্রিবেণী ও বাঁশ বেড়িয়ার মধ্য স্থলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। যে সাক্ষাৎ লাভ সেই শাস্ত্রীয় কথারম্ভ! এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এই একটী বিশেষ গুণ, ভালই হউক আর মন্দই হউক তাঁহারা বিচারে এলেন না। সুতরাং রমাবল্লভ কথায়২ অন্যমনস্ক হইয়া পুনরায় ত্রিবেণীর দিকে আসিতে লাগিলেন। তিনি জগন্নাথের কথার বাঁধনি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন,

তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এইরূপে, জগন্নাথ তাঁহাকে টোলে আনিয়া আহারাদি করাইয়া পরম সমাদরে বিদায় করিলেন।

জগন্নাথ বুদ্ধিনৈপুণ্য ও অভিনিবেশ সহকারে আরও সাত আট বৎসর ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রানুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া এককালে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। লেখা পড়ার কথায় এত আমোদ ছিল যে, শাস্ত্র ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। একবার যাঁহার সহিত বিচার হইত তিনিই জগন্নাথকে বিশেষরূপে চিনিয়া যাইতেন। ক্রমশঃ দেশ বিদেশের সকলেই জানিতে পারিলেন যে, জগন্নাথ এক জন প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি। এই সময়ে তাঁহার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। বাল্যকালে যেমন বিজাতীয় দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র ছিলেন এক্ষণে তেমনই শান্ত ও সদাচারী হইলেন। এইটী যে, বিদ্যানুশীলনের ফল তাহাতে আর সন্দেহ কি?।

চব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। রুদ্রদেবের কিছুই সংস্থান ছিল না, সংসারের ভার মাতায় পড়িল দেখিয়া জগন্নাথ ভাবিয়া আকুল হইলেন। অবস্থা এত মন্দ ছিল, পরে কি হইবে তাহা ভাবা দূরে থাকুক, কিরূপে গলার কাচা ফেলিয়া শুদ্ধ হইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সর্ব্বস্ব বেচিয়া কিনিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ একরূপ নির্ব্বাহিত করিলেন; কিন্তু আজ খান এমন সঙ্গতি রহিল না!

কিছু২ না আনিলে আর কোন রূপেই চলে না। অতএব জগন্নাথকে টোলের পড়া ছাড়িয়া উপার্জ্জনের উপায় দেখিতে হইল। এই সময়েই অধ্যাপক তাঁহাকে "তর্কপঞ্চানন" এই উপাধি দিলেন। কোন ক্রমে এক খানি টোল বাঁধিয়া কয়েকটী ছাত্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উত্তরোত্তর বিলক্ষণ নাম সম্ভ্রম হইয়া উঠিল, নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণের পত্র আসিতে লাগিল। যিনি কিছু দিন পূর্ব্বে পরের কাছে জলপাত্র চাহিয়া কর্ম্ম

তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এইরূপে, জগন্নাথ তাঁহাকে টোলে আনিয়া আহারাদি করাইয়া পরম সমাদরে বিদায় করিলেন।

জগন্নাথ বুদ্ধিনৈপুণ্য ও অভিনিবেশ সহকারে আরও সাত আট বৎসর ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রানুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া এককালে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। লেখা পড়ার কথায় এত আমোদ ছিল যে, শাস্ত্র ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। একবার যাঁহার সহিত বিচার হইত তিনিই জগন্নাথকে বিশেষরূপে চিনিয়া যাইতেন। ক্রমশঃ দেশ বিদেশের সকলেই জানিতে পারিলেন যে, জগন্নাথ এক জন প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি। এই সময়ে তাঁহার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। বাল্যকালে যেমন বিজাতীয় দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র ছিলেন এক্ষণে তেমনই শান্ত ও সদাচারী হইলেন। এইটী যে, বিদ্যানুশীলনের ফল তাহাতে আর সন্দেহ কি?।

চব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। রুদ্রদেবের কিছুই সংস্থান ছিল না, সংসারের ভার মাতায় পড়িল দেখিয়া জগন্নাথ ভাবিয়া আকুল হইলেন। অবস্থা এত মন্দ ছিল, পরে কি হইবে তাহা ভাবা দূরে থাকুক, কিরূপে গলার কাচা ফেলিয়া শুদ্ধ হইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সর্ব্বস্ব বেচিয়া কিনিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ একরূপ নির্ব্বাহিত করিলেন; কিন্তু আজ খান এমন সঙ্গতি রহিল না!

কিছু২ না আনিলে আর কোন রূপেই চলে না। অতএব জগন্নাথকে টোলের পড়া ছাড়িয়া উপার্জ্জনের উপায় দেখিতে হইল। এই সময়েই অধ্যাপক তাঁহাকে "তর্কপঞ্চানন" এই উপাধি দিলেন। কোন ক্রমে এক খানি টোল বাঁধিয়া কয়েকটী ছাত্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উত্তরোত্তর বিলক্ষণ নাম সম্ভ্রম হইয়া উঠিল, নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণের পত্র আসিতে লাগিল। যিনি কিছু দিন পূর্ব্বে পরের কাছে জলপাত্র চাহিয়া কর্ম্ম

নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে ঘড়া গাড়ু প্রভৃতি জলপাত্র তাঁহার ঘরে ধরে না! এইরূপে তাঁহার ভাগ্য-বৃক্ষে অসংখ্য মঙ্গল-ময় ফল ফলিতে লাগিল।

এই সময় হইতে পঞ্চাননের ক্রমে২ তিনটী পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠের নাম কালিদাস, দ্বিতীয়ের নাম কৃষ্ণ চন্দ্র এবং তৃতীয়ের নাম রামনিধি। দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের অনেক সন্তান হইয়াছিল। ঐ সকল সন্তানের মধ্যে কৃষ্ণ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম অতি আশ্চর্য্য লোক ছিলেন। এখানে তাঁহার বিষয় কিছু না লিখিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

তিনি ন্যায় ও ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। এখনকার লোকদিগের যেমন চাকরীই বিদ্যার উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং চাকরীর জন্য মান অপমান ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুতেই দৃষ্টি থাকে না, সার্ব্বভৌমের সমকালে যে সেরূপ ছিল না, তাঁহারই চরিত্র ঘটিত একটী বিষয় তাহার পরিচয়

দিতেছে। অথবা তিনিই অসামান্য চরিত্র ছিলেন। একদা সদর দেওয়ানীর জজ্ মহামান্য কোলব্রুক্ সাহেব ঘনশ্যামকে সেই আদালতের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিরোহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া দূরে থাকুক, ইহা শুনিবামাত্র তিনি যত চিন্তাকুল ও বিষণ্ণ হইলেন, বিচার কর্ত্তা কর্ত্তৃক কেহ কারাবাস বা নির্ব্বাসনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও তত হয় না। চাকরী স্বীকার করিলে জীবন অপবিত্র ও শাস্ত্র অধ্যয়ন নিষ্ফল হইবে, তাঁহার মনে এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল। কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন! কিন্তু পরিশেষে, পরিজন ও বান্ধবগণের অনুরোধে তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

মহাত্মা জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন কি শুভক্ষণেই পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলা যায় না। তিনি অসাধারণ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গৌরবের সীমা ছিলনা। তিনি যদি কেবল ধনী হইতে

অভিলাষ করিতেন বোধ করি, আপনার বিদ্যা ও সম্মানের অনুরূপ ধনশালী হইতে পারিতেন। তথাপি স্বচ্ছন্দে তাঁহার এত আয় হইত যে, তাঁহাকে ধনী বলিয়া পরিচিত হইতে হইয়াছিল। তখনকার প্রধান শাসন-কর্ত্তা সর্জন শোর ও বিচার পতি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি বড়২ লোকের অনুরোধে দুরূহ সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অনেক ব্যবস্থা অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। "অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ" এবং "বিবাদ ভঙ্গার্ণব" নামক দায় সংক্রান্ত দুই বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ের অনেক মোকর্দ্দমা তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে নিষ্পন্ন হইত। নবাব সিরাজ উদ্দৌলা তাঁহাকে একটী শীল মোহর প্রদান করিয়াছিলেন। উহাতে "সুধীবর কবি বিপ্রেন্দ্র শ্রীযুত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।" এই কয়টী অক্ষর অঙ্কিত ছিল। তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা পত্র সকলে এই মোহরের সহী দিতেন। তাঁহার বিদ্যা,

বুদ্ধি ও অধ্যাপনার রীতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে টোল বিলক্ষণ জাঁকিয়া উঠিল। বিদ্যার্থিগণ নানা দেশ হইতে আসিতে লাগিল। ছাত্র-সংখ্যা প্রায় এক শত হইয়া উঠিল। তিনি প্রত্যহ এই বহু ছাত্রের আহার প্রদান করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে ছাত্রেরাও একং জন বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ঐ সকলের মধ্যে কাহারওং সন্তানেরা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া স্থানেং বিদ্যালোচনা করিতেছেন।

তাঁহার গৌরবের কথা কি কহিব। কি দরিদ্র, কি ধনবান্, কি মূর্খ, কি বিদ্বান সকলেই তাঁহাকে আদর করিতেন এবং পূজনীয় দেবতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। নানা প্রকার শাস্ত্রীয় কথা; কাব্যেতিহাসের মনোরম উপখ্যান এবং অন্যান্য রহস্য জনক কথা শ্রবণ মানসে তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতেন।

যিনি ইংরাজদিগের অভ্যুদয়-কালে যাটি

টাকা বেতনের মুন্‌সিগিরি করিতেং রাজা হইয়া উঠিলেন, সেই রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সহিত পঞ্চাননের প্রণয় হইয়াছিল। কলিকাতার শোভাবাজারে ইহাঁর বাড়ী। ইনি, পঞ্চাননকে অতিশয় সম্মান করিতেন, সর্ব্বদা তাঁহার বাটী গমন করিতেন এবং নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। জগন্নাথকে ইনিই প্রথমে কোটা করিয়া দেন এবং তাঁহার সাহায্যেই তিনি চণ্ডীমণ্ডপ বাঁধিয়া দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করেন।

দেওয়ান নন্দ কুমার রায়,—যিনি নবাব সরকারে ভারীং চাকরী করিয়া অতিশয় সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, যিনি আপনার সময়ে একজন প্রধান বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য হইতেন, তিনি পঞ্চাননকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিতেন। অবকাশ পাইলেই ত্রিবেণী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন।

তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হারিংটন্ সাহেব অবসর

পাইলেই পঞ্চাননের ভবনে আগমন করিতেন এবং ব্যবস্থা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকিলে তাহার মীমাংসা করিয়া লইয়া যাইতেন। হ্যারিংটনের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

অসাধারণ বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন জগদ্বিখ্যাত সর উইলিয়ম্ জোন্স সেই সময়ে এই দেশে বিষয় কর্ম্ম করিতেন। তিনি জগন্নাথের বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া যখন তখন ত্রিবেণীতে সস্ত্রীক হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এক দিন দেখা করিতে আসিয়াছেন, এমন সময়ে এক জন তাঁহাকে পূজার দালানে উঠিয়া বসিতে কহিলে তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা "আবাং ম্লেচ্ছৌ"—ইত্যাদি সংস্কৃত কথা দ্বারা পূজার দালানে বসিবার প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ করিলেন। পরে গৃহ মধ্যে গমন করিয়া বিবিধ সদালাপে পুরবাসিনী ও প্রতিবেশিনী কামিনীগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

নবদ্বীপের জজ সাহেব আপনার বাঙ্গালা-

খ্যাপক রামলোচন কবিরাজের মুখে জগন্নাথের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। রামলোচন ত্রিবেণী আসিয়া আগ্রহের সহিত সাহেবের অভিলাষ প্রকাশ করিলে পঞ্চানন নবদ্বীপ গমন করিলেন। জজ সাহেব যেমন শুনিয়াছিলেন, আলাপ পরিচয় দ্বারা তদনুরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্বাভিপ্রেত কতিপয় ব্যবস্থার অনুবাদে অনুরোধ করিলেন। তর্কপঞ্চানন তাঁহার উপকারের জন্য কিছু দিনের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

এই সময়ে দেশে ডাকাইতির ভয় হইয়াছিল। ভীরুস্বভাব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জগন্নাথ সেই জন্য সততই শঙ্কিত থাকিতেন। আবার তাঁহার দশ টাকার সম্ভাবনা থাকাই সেই শঙ্কার বিশেষ কারণ হইয়াছিল। প্রধান বিচারপতি সর উইলিয়ম জোন্স পঞ্চাননকে বিশেষ সম্মান করিতেন ও তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। ঐ ব্যাপার অবগত হইয়া

নিজে বেতনের বন্দোবস্ত করত তাঁহার রক্ষার জন্য কয়েক জন বন্দুকওয়ালা সিপাহী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা পঞ্চাননের বাড়ীতে অহর্নিশ পাহারা দিত।

বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তি চন্দ্র রায় পঞ্চাননের প্রতি বিলক্ষণ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক নিষ্কর ভূমি এবং নিজ ত্রিবেণীতেই একটী বৃহৎ পুষ্করিণী দান করেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে রাজা নবকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের নিতান্ত হিতাভিলাষী ছিলেন। তিনি এক্ষণে তাঁহাকে আপন ইচ্ছায় লক্ষ টাকা মুনাফার একখানি তালুক দিতে চাহিলেন। কিন্তু পঞ্চানন, বিষয় অনেক অনর্থের মূল—ধনী হইলে তাঁহার বংশীয়েরা বাবু হইয়া যাইবে—ক্রমে বংশে বিদ্যার আলোচনা কমিয়া আসিবে এইরূপ ভাবিয়া তালুক গ্রহণে অসম্মত হইলেন। শেষে রাজা অনেক যত্নে এবং জমীদারী সংক্রান্ত সমুদায় ভার আপন হাতে রাখিয়া ত্রিবেণীর নিকটে 'হেদে পোতা' নামে এক খানি অল্পলাভের তালুক তাঁহাকে গ্রহণ করাইলেন।

নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহাকে অধ্যাপনা কার্য্যে উৎসাহী করিবার জন্য উখুড়া পরগণায় সাত শত বিঘা জমী দান করেন। ঐ জমীর উপস্বত্বেই তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পঞ্চাননের ব্যবস্থা-বলে পুটিয়ার রাজা একটী মোকর্দ্দমা জিতিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। ইনি বাল্যকালে মন দিয়া ও শ্রম করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার শেষ দশায় এই রূপে সম্মানের সহিত চারিদিক হইতে লাভ হইতে লাগিল। হে বালকগণ, তোমরাও মন দিয়া লেখা পড়া কর;—এক এক জন এক এক জগন্নাথ হইতে পারিবে।

তাঁহার যেমন লাভ হইতে লাগিল তিনি তেমনিই সদ্ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অতিথি সেবা ছিল; যে, যখন উপস্থিত হইত সাধ্যানুসারে তাহার আহার প্রদান করিতেন। তদ্ভিন্ন দুর্গোৎসব, শ্যামা পূজা

প্রভৃতি ক্রিয়া কাণ্ড গুলি যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া তদুপলক্ষেও অন্ন ও অর্থ বিতরণ করিতেন।

তাঁহার বুদ্ধি ও মেধা যে, কত প্রবল ছিল বলা যায় না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি বিষয়ে একটী আশ্চর্য্য গল্প প্রসিদ্ধ আছে; এখানে সেটী না বলিয়া থাকা গেল না। এক দিন ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতে ছিলেন। এমন সময়ে সেখানে এক খানা বজরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ বজরা হইতে দুই জন সামান্য ইংরাজ তীরে নামিয়া পরস্পর ঝগড়া বাধাইয়াদিল। দুই জনে বিলক্ষণ গালাগালি ও ঘুঁসোঘুঁসি হইয়া গেল। পঞ্চানন, আহ্নিক করিতে২ তাহাদের আগাগোড়া ঝগড়া দেখিলেন।

সাহেবেরা বিবাদ করিয়া উভয়েই উভয়ের নামে আদালতে লালিস্ করিল। বিচারপতি, তাহাদের কেহ সাক্ষী আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল "আমাদের সাক্ষী কেহই নাই।" হাকিম পুনরায়

জিজ্ঞাসা করিলেন "সে সময়ে ঘাটে আর কোন লোক ছিল কি না?" তাহারা কহিল "হাঁ! আমরা যখন ঝগড়া করি; তখন এক জন বৃদ্ধ সকল গায় মাটী মাখিয়া জলের ধারে বসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া কি বকিতে ছিল।" ঐ সময়ে ঘাটে কে ছিল, জানিবার জন্য ত্রিবেণী লোক প্রেরিত হইল।

যদিও পঞ্চানন অবগত ছিলেন, বিচারালয়ে মিথ্যা বলা আর জানিয়া শুনিয়া সাক্ষ্য না দেওয়া উভয়ই পাপ-জনক ও নীতি-বিরুদ্ধ; তথাপি আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া দেশাচার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রথমে বা ঢাকা হইয়াছিলেন। সুতরাং বিচারক অনেক অনুসন্ধানের পর তবে জানিতে পারিলেন যে, সে সময় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতে ছিলেন। পঞ্চানন বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। সাহেবদের বিবাদের বিষয় কিছু জানেন কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি কহিলেন—"উহারা মারামারি করিয়াছেন দেখিয়াছি, দুই

জনে গালাগালি করিয়াছেন শুনিয়াছি; কিন্তু ইংরাজী জানি না বলিয়া অর্থ বুঝিতে পারি নাই। তবে কে কাহার পর কিরূপ শব্দ বলিয়াছিলেন সব বলিতে পারি।" বলিয়া যে যাহাকে যেরূপ শব্দ দ্বারা গালি দিয়াছিল পর পর সমুদায় অবিকল বলিলেন!! হাকিম শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলের,—"আপনি ইংরাজী জানেন না বলিয়া আমাকে ছলনা করিতেছেন; অর্থ বুঝিতে না পারিয়া যার পর যেটী এত শব্দ মনে করিয়া রাখা নিতান্ত অসম্ভব।" পঞ্চানন বলিলেন. "আমি ইংরাজী একটী শব্দেরও অর্থ বুঝিতে পারি না।"

বিচার-পতির, মারপিটের মোকর্দ্দমা করা ঘুরিয়া গেল। পঞ্চানন ইংরাজী জানেন বলিয়া তাঁহার এত সন্দেহ হইয়াছিল তিনি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাহার সবিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিবেণী লোক প্রেরিত হইল। পরিশেষে এই জানিতে পারিলেন যে, তিনি পাঁচবৎসর হইতে

এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এক জন এদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

বিচার-পতি দেখিলেন জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন অসামান্য লোক। বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ হইলে মানুষের স্মৃতি শক্তি থাকে না—সততই সকল কথা ভুলিয়া যায় কিছুই মনে থাকে না; কিন্তু ইঁহার এপর্য্যন্ত স্মৃতিশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ইনি অতি মহৎ লোক,—এরূপ মনুষ্যকে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হয়। এই ভাবিয়া বহুসম্মানের সহিত তাঁহাকে কোন রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে কেবল অভ্যাস দ্বারা পঞ্চাননের স্মৃতিশক্তি তাদৃশ বর্দ্ধিত হইয়া প্রাচীনকাল পর্য্যন্ত প্রবল ছিল।

জনশ্রুতিতে শুনা যায় তাঁহার চরিত্র সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ ছিল না। কিন্তু জাতীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল এবং ঐ ধর্ম্মের

কর্ম্ম কাণ্ডেও যত্ন ছিল। বড় আমোদ-প্রিয় ও অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি বড় লোক অন্যে জানিত;—কিন্তু তাঁহার সে নিমিত্ত অহঙ্কার ছিল না।

দেখ! জগন্নাথ কেমন অদ্ভুত লোক! শ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া অল্পবয়সে পণ্ডিত হইয়া পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতেন; পিতৃ-শ্রাদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, তাহার পর কেমন ধন-উপার্জ্জন করিলেন;—দেশ বিদেশে কেমন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন—দেশের কত উপকার করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

—●●●—

ইনি, ১১১৯ সালে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী 'ভুরসুট' পরগণার মধ্যে পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়; তিনি সম্ভ্রান্ত ও বড় মানুষ ছিলেন, ভুরসুট তাঁহার জমীদারী ছিল। তাঁহাদের প্রকৃত উপাধি মুখোপাধ্যায়; অনেক বিষয় ছিল বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা রাজা ও রায় বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করিত। নরেন্দ্র নারায়ণের চারি পুত্র; তন্মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ।

যখন ভারতের ৯।১০ বৎসর বয়স, তখন বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা জমীদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে নরেন্দ্র

নারায়ণের উপর রাগ করিয়া তাঁহার বাড়ী লুট করত সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে নরেন্দ্র নারায়ণ একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, অতি কষ্টে বহুপরিবারের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন।

ভারত এই সময়ে পলাইয়া মণ্ডল ঘাট পরগণার মধ্যে গাজীপুরের নিকট নওয়া পাড়া গ্রামে আপনার মামার বাড়ী গেলেন এবং সেই খানে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ ও অমর-কোষ অভিধানে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলেন। পরে তাজপুরের নিকট সারদা গ্রামে কোন গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী গেলেন। এই অযোগ্য বিবাহ এবং সংস্কৃত পড়ার জন্য ভাইয়েরা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। কারণ সে সময়ে যবনেরা দেশের রাজা বলিয়া সংস্কৃতের আদর ছিল না। ভারত সেই তিরস্কারে অপ্রতিভ হইয়া মনোদুঃখে বাড়ী ছাড়িলেন। ঘুরিতে২ হুগলীর উত্তর

দেবানন্দপুর গ্রামবাসী কায়স্থ রামচন্দ্র মুন্‌সির গৃহে উপস্থিত হইয়া পারসী পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু কোন বিষয়ের রীতিমত বর্ণনা করিয়া কাহাকেও দেখাইতেন না, মনে২ তাহার অনুশীলন করিতেন। কবিতা লেখা অপেক্ষা এই সময়ে তিনি পারসী পড়িতেই অধিক শ্রম করিতেন। একবার রাঁধিয়া দুইবার খাইতেন,—একটী বেগুন পোড়ার আধখানি দিন মানে—খাইয়া আর আধখানি রাত্রির জন্য রাখিয়া দিতেন।

একদিন ঐ মুন্‌সী মহাশয়, সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান আছে বলিয়া ভারতকে সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়িতে আদেশ করিলেন। অন্যান্য কবিগণের রচিত সত্যনারায়ণের পুঁথি থাকিলেও ভারত বাঙ্গালা কবিতায় পুনরায় উহা রচনা করিয়া সমাজে আনিয়া পাঠ করিলেন। এই নূতন পুঁথি শুনিয়া সকলে এক বাক্যে ভারতের যথেষ্ট প্রশংসা

করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাদৃশ উত্তম রচনা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। তবু ভারতের বয়স তখন পনর বৎসরের অধিক নয়। এখন তাঁহার রচিত দুই রকম সত্যনারায়ণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কোন্‌টী কোন্ সময়ে কোথা থাকিয়া রচনা করিয়াছিলেন বলা যায় না! ফলে ইহাই তাঁহার কবিত্ব-তরুর প্রথম অঙ্কুর!

ভারত, দেবানন্দপুর হইতে অনুমান ১১৩৯ সালে বাড়ী গিয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ কৃত-বিদ্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইলেন। কিছু দিনের পর ভারতের পিতা পুনরায় কিছু ইজারা লইয়াছিলেন। এক্ষণে ভারত, পিতা ও ভ্রাতৃগণের আদেশে সেই ইজারা সম্বন্ধে মোক্তার হইয়া বর্দ্ধমানে গমন করিলেন। কোন সময়ে ভ্রাতৃগণ খাজনা পাঠাইতে বিলম্ব করায়

রাজা ঐ ইজারা খাস করিয়া লইলেন। ভারত সাহসী হইয়া সেই বিষয়ে উপযুক্ত রূপ আপত্তি করাতে কর্ম্মচারি-গণ রাগ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। ভারত, কিছু দিন পরে কারারক্ষকের সহিত যোগ করিয়া পলায়ন করত একেবারে তৎকালীন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্যতম রাজধানী কটকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার দয়াবান্ সুবেদার শিবভট্টের অনুগ্রহে কিছু দিন সেখানে থাকিয়া পুরুষোত্তম গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। শাসনকর্ত্তা তত্রত্য পাণ্ডাদিগের প্রতি চিটি দিলেন। সেই চিটি থাকাতে শ্রীক্ষেত্রের যেখানে সেখানে মাশুল (১) না দিয়া বাস করিতে পারিতেন এবং আহারের জন্য প্রত্যহ পুরী হইতে একটী করিয়া বল-রামী আট্‌কে (২) পাইতেন। সঙ্গের চাকর ও আপনি দুই জনে তাহা ভাগ করিয়া খাইতেন।

(২) এক নাগরী আলোচালের ভাত, এক কটরা ঝালের তরকারী এবং এক কটরা অহরের দাউল।

এই স্থানে থাকিয়া তিনি ভাগবত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যান্য অনেক গ্রন্থ পাঠ করেন। বৈষ্ণবদিগের দলে মিশিয়া কিছু দিন আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন।

পরে বৃন্দাবন যাইবার জন্য পুরুষোত্তম হইতে যাত্রা করিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার ভায়রা ভাইয়ের বাস ছিল; ভারত আসিয়াছেন শুনিবামাত্র তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে সংসার ধর্ম্মে উদাসীন দেখিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন। অনেক যত্নে পুনরায় সংসারী করিলেন। কিন্তু ভারত যতদিন "অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারি তত দিন বাড়ী যাইব না।" বলিয়া পিতা মাতা এবং ভাতৃ-গণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

এই সময়ে ভায়রা ভাই ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সারদাগ্রামে শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের বাড়ী গিয়া কিছু দিন সুখে বাস করিয়াছিলেন। যখন তথা হইতে প্রস্থান করেন, শ্বশুরকে

বলিয়া গেলেন, তাঁহার পিতা কিম্বা ভ্রাতারা লইতে আইলেও তাঁহার কন্যাকে পাঠাইয়া না দেন। ইহাতে বেশ বোধ হইতেছে কোন কারণ বশতঃ পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার মন চটিয়া গিয়াছিল।

পরে, তিনি ফরাসী গরর্ণমেণ্টের দেওয়ান সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট ফরাসডাঙ্গায় গমন করিলেন এবং আপনার পরিচয় দিয়া আশ্রয় চাহিলেন। দেওয়ান ভারতের বিদ্যা বুদ্ধি ও পূর্ব্বাপর অবস্থার পরিচয় পাইয়া এবং সুকৌশল যুক্ত প্রর্থনা বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "তুমি অতি যোগ্য ও সদ্বংশজাত, তোমার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ভাল! তুমি কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান কর; আমি সবিশেষ চেষ্টায় থাকিলাম,—সুযোগ পাইলেই তোমার মঙ্গল সাধন করিব।" এই কথায় ভারত সন্তুষ্ট হইয়া সেই খানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে যাঁহার জীবন-চরিত লেখা হই-

য়াছে সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ঐ দেওয়ান চৌধুরীর নিকট মধ্যেং টাকা ধার করিতে আসিতেন। এক দিন, তিনি ফরাসডাঙ্গায় উপস্থিত হইলে চৌধুরী মহাশয় ভারতের পরিচয় দিয়া তাঁহার প্রতিপালনের নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা তাঁহাকে রাজধানী যাইতে কহিয়া গেলেন। অনন্তর, ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরে গমন করিলে মাসিক ৪০ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া বাসা দিলেন। তিনি প্রতি দিন, প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দুইটী কবিতা প্রস্তুত করিয়া রাজাকে দেখাইতেন। রাজা এই অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধি দিলেন। এবং পরস্পর অসম্বদ্ধ উদ্‌ভট কবিতা রচনা করিতে নিষেধ করিয়া মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর (১) চণ্ডীর প্রণালীতে

(১) যদিও ইহাঁর পূর্ব্বে দুই একজন বঙ্গ ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত রূপে ইহাকেই বঙ্গ ভাষার প্রথম ও প্রধান কবি বলা যাইতে পারে। ইনি, 'কবিকঙ্কন' বলিয়া খ্যাত।

অন্নদা-মঙ্গল নামক একখানি কাব্য লিখিতে অনুমতি করেন্। ভারত তাঁহার আজ্ঞায় পরম যত্নে অন্নদামঙ্গল রচনা করেন, 'বিদ্যা-সুন্দর' নামে এক পরম সুন্দর প্রস্তাবও উহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে, বাঙ্গালা কবিতায় রসমুঞ্জরী নামক একখানি সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করিলেন। ঐ সকল গ্রন্থই অতি উত্তম। অধিক কি! ঐ পুস্তকের ন্যায় সুললিত ও ভাব শুদ্ধ কবিতা অধিক দেখা যায় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়! উহার অধিকাংশ এতাদৃশ অশ্লীল যে, নির্জ্জনে বসিয়া মনে২ পাঠ করিলেও পাঠককে লজ্জিত হইতে হয়। অশ্লীলতা দোষে দূষিত না হইলে অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন ও মধ্য কালের কবিগণের কাব্য সাহিত্য সমাজের প্রধান সম্পত্তি হইত সন্দেহ নাই। যাহাহউক, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। এবং ইহা দ্বারাই তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন। যখন অন্নদামঙ্গল রচনা করেন তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর।

রায় গুণাকর আপনার অসাধারণ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য গুণে নবদ্বীপাধিপতির প্রিয়পাত্র হইয়া যথেষ্ট সম্মান ও সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন রাজা কথায়২ তাঁহার সংসার ধর্ম্মের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারত বলিলেন,—"আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে আছেন, ভ্রাতৃ-গণের সহিত প্রণয় না থাকায় বাড়ী যাইতে অভিলাষ নাই; তবে উপযুক্ত স্থান পাইলে ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া সংসার করিতে অভিলাষ আছে।" ইহাতে রাজা বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য ১০০ টাকা এবং গঙ্গার ধারে মূলাযোড় গ্রামে বৎসরে ৬০০ টাকা আয়ের ইজারা দিয়া তথায় বাস করিতে কহিলেন।

ভারত ঐ টাকা ও ইজারার সনন্দ লইয়া মূলাযোড়ে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য ঘোষালদিগের একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন; এবং স্ত্রীকে তথায় আনিয়া যত দিন নূতন গৃহ প্রস্তুত না হইল, ততদিন সেই ভাড়াটিয়া বাটীতে রহিলেন। ভারত গঙ্গার ধারে

বাড়ী করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার পিতাও আসিয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। ভারত যথাবিধি পিতৃ-কৃত্য নির্ব্বাহ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণনগরে গমন পূর্ব্বক নানা বিষয়িণী কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি কখন কৃষ্ণনগরে, কখন মূলাযোড়ে ও কখন বা ফরাসডাঙ্গায় বাস করিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দির অধিকারকালে যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল,—(যাহা বর্গীর হঙ্গাম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে) সেই সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা তিলক চন্দ্রের মাতা তাহাদিগের ভয়ে পলাইয়া আসিয়া মূলাযোড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ কড়িগাছি গ্রামে বাস করেন। বাসস্থানের নিতান্ত নিকট বলিয়া মূলাযোড় গ্রামখানি পত্তনি লইবার মানসে কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি দিতে সম্মত হইলেন। তাহাতে ভারতচন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া

"আমি কোথায় যাইব?" বলিয়া রাজাকে জানাইলে তিনি আনরপুরের অন্তঃপাতী গুস্তেতে ১৫০ বিঘা ও মূলাযোড়ের ১৬ বিঘা ভূমির স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান ও গুস্তেতে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি যেখানে বাস করিতে ছিলেন সেখানকার লোকেরা তাঁহার গুণে নিতান্ত বাধ্য হইয়াছিল, এখন তিনি ঐ স্থান ছাড়িতে উদ্যত হইলেও তাহারা তাঁহাকে কোন মতেই ছাড়িল না; সুতরাং ভারতকে ঐ মূলাযোড়েই থাকিতে হইল।

বর্দ্ধমানের রাণী, রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় পত্তনী লইয়াছিলেন। ঐ নাগ কর্ত্তা হইয়া গ্রামবাসিদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। ভারত, তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং আপনিও নাগের দংশনে পীড়িত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় 'নাগাষ্টক' নামে আটটী কবিতা রচনা পূর্ব্বক কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দিলেন। এই লেখাতে ভারত কিছু বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছি-

লেন। পাঠ করিয়া রাজা এককালে শোক ও সন্তোষে মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই নাগ-কৃত অত্যাচার নিবারণ করিয়া দিলেন। পণ্ডিত মাত্রেই নাগাষ্টকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ভারত বাঙ্গালা ভাষায় প্রশংসনীয় কবিতা লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী, ব্রজবুলি প্রভৃতিতেও কবিতা রচনা করিয়া সেই২ ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতের পূর্ব্বে কবিকঙ্কণ কৃত্তি-বাস, কাশীদাস প্রভৃতি অনেকে বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ছন্দঃ লালিত্য ও রচনা চাতুর্য্যে কেহই ভারতের ন্যায় ছিলেন না।

আক্ষেপের বিষয়! এই, যিনি বাল্যকাল হইতে যার পর নাই শ্রম ও কষ্ট করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, যিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময়ে অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, যিনি পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব গুণে সর্ব্বত্র মান্য হইয়াছিলেন, যাঁহার

গ্রন্থ সকল পণ্ডিতগণ আদর পূর্ব্বক সন্তুষ্ট চিত্তে পাঠ করেন, যাঁহার উদ্ভাবিত ছন্দঃ প্রণালী আধুনিক অনেক কবির আদর্শ হইয়া আছে; সেই মহামহোপাধ্যায় ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর ৪৮ বৎসর বই পৃথিবীতে ছিলেন না। ১১৬৭ সালে বিষমাগ্নি (১) রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন!! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই।

দেখ! রায় গুণাকর প্রথম বয়সে কত কষ্ট পাইয়াছিলেন; ৮।৯ বৎসর বয়সের সময় বাড়ী ছাড়েন, পর প্রত্যাশী হইয়া বেগুন পোড়া ভাত খাইয়া লেখা পড়া শিখেন, মোক্তারী করিতে গিয়া কাটকে যান,—সন্ন্যাসী হইয়া দেশে২ ভ্রমণ করেন, ফরাস-

(১) হিন্দু বৈদ্যকের মতে উদরাগ্নি তিন প্রকার; সমাগ্নি, মন্দাগ্নি, ও বিষমাগ্নি। এই বিষমাগ্নি রোগকেই ভস্ম-কীট বলিয়া থাকে।

ভাঙ্গায় কতদিন পরান্নে শরীর পোষণ করেন। তথাপি লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত যে, শ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, কেবল তাহার গুণেই শেষে এত সুখী হয়েন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রধান আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভারত, মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে 'চণ্ডী-নাটক' নামে এক খানি বাঙ্গালা-হিন্দি মিশ্রিত নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অবিবেচক কাল উহা তাঁহাকে সম্পন্ন করিতে দেয় নাই। এই খানির লেখা সাঙ্গ হইলে পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টি হইত।

—•••—

কৃষ্ণ পান্তী। (১)

—•••—

কৃষ্ণপান্তী ধনী ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত; তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত প্রীতিকর ও কৌতুকাবহ; এই নিমিত্ত তাঁহার সঙ্ক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সঙ্কলন করিলাম।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী রাণাঘাট গ্রামে ১১৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কোন তিলির গৃহে কৃষ্ণপান্তী জন্ম প্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সহস্র রাম পান্তী; তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন, পান বিক্রয় করিয়া অনেক কষ্টে পরিবারের ভরণ পোষণ করিতেন। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল; তন্মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠ।

(১) ইহাঁর জাতীয় উপাধি পাল; পিতার পান বিক্রয়ের ব্যবসায় হইতেই পান্তী বলিয়া খ্যাত হন।

রাণাঘাটের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে গাংনাপুর নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। বহুদিন ধরিয়া সেখানে একটী হাট বসিয়া থাকে, অনেক দূর হইতে লোকেরা নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া কেনা বেচা করিতে আইসে। সহস্ররামও বোঝা মাতায় করিয়া তথায় প্রতিহাটে পান বেচিতে যাইতেন। সমস্ত দিন পান বেচিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতে সংসারের আবশ্যক দ্রব্যাদি এবং ছোট২ ছেলেদের জন্য কতক গুলি মুড়ির মোয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র আপনার ভাই ও অন্য অন্য পাড়ার সাথী সকলের সহিত আমোদ করিয়া মোয়া খাইতেন। তিনি কোন২ দিন পিতার সঙ্গে হাটে যাইতেন, পরে বড় হইয়া সেই ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তিনি পান বেচার ব্যবসায়েই আপনার বুদ্ধি, শ্রমশক্তি ও সত্য-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করিতেন, রাগ করিয়া লোককে চড়া

কথা বলিতে জানিতেন না। ঐ ব্যবসায়ে কিছু সংগতি করিয়া কয়েকটী বলদ ক্রয় করিলেন। রাণাঘাটের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে কায়েত পাড়া নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে কতক গুলি 'তুঁষকোট' তিলি বাস করে;—তাহারা বলদ চালানর ব্যবসায় করিত। কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কোন স্থানে কোন জিনিস্ সস্তা হইয়াছে শুনিলেই সে স্থানে গমন পূর্ব্বক উহা ক্রয় করিয়া বলদের পীঠে বোঝাই করত আবার যেখানে ঐ দ্রব্য মহার্ঘ হইয়াছে শুনিতেন তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া বেচিয়া ফেলিতেন। এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক কিছুকাল চাল, ছোলা, মটর, গম, যব, সরিষা, ধুলেপুরে ধান, ধঞ্চের কাঠ প্রভৃতির ব্যবসায় করিলে আরও কিছু আয় বৃদ্ধি হইল।

অতঃপর কৃষ্ণপাস্তীর ভাগ্য তরুতে অদ্ভুত ফল ফলিতে আরম্ভ হইল।—১১৮৬ সালে কলিকাতায় ছোলা দুষ্প্রাপ্য হইয়া-

ছিল, বস্তু দুষ্প্রাপ্য হইলেই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে। এই সময়ে কলিকাতায় ছোলা বেচায় বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া বহু-সঙ্খ্যক মহাজন উহার অনুসন্ধানে চারিদিকে গমন করিল।

এই সকল মহাজনের মধ্যে এক জন নৌকাযোগে চুর্ণি নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া রাণাঘাটের যে ঘাটে কৃষ্ণপান্তী স্নানাহ্নিক করিতেছিলেন সেই ঘাটে নৌকা বাঁধিলেন। তাঁহাকে মহাজন বলিয়া চিনিতে পারিয়া কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? প্রয়োজন কি? এবং কোথা যাইবেন?।" মহাজন উত্তর করিলেন,—"কলিকাতা হইতে আসিতেছি; কিন্তু কোথা যাইব তাহার ঠিকানা নাই। যেহেতু কোথায় গমন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তাহা জানি না।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন,—"আপনি যদি আমাকে সওদাপত্র লেখা পড়া করিয়া দেন—আমি ছোলা

আমদানী করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া মহাজন লেখা পড়া করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সেই সওদাপত্র হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর নামে এক দেব বিগ্রহ আছেন। পূর্ব্বতন কোন আঢ্য হিন্দু তাঁহার নামে অনেক বিষয় করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার সেবা, অতিথিসেবা ও বহু নাগা সন্ন্যাসীর নিত্য ভরণ পোষণ প্রভৃতি নির্ব্বাহ হইয়াও বৎসর২ অনেক টাকা বাঁচিত। সেই দেব গৃহের মোহান্ত বা অধ্যক্ষ ঐ টাকায় মহাজনী তেজারতী করিয়া আরও বিষয় বাড়াইতেন। এইরূপে যুগল কিশোরের অনেক বিষয় হইয়াছে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় গঙ্গারাম মোহান্ত নামক এক ব্যক্তি ঠাকুর বাড়ীর অধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি এক দিন দেখিলেন পোকা লাগিয়া চারি পাঁচ গোলা ছোলা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। উপরে কিছু নাই, একেবারে

খোসা করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি উপর দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, হয়ত সমুদায় ছোলাই ঐরূপ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—"ছোলা গুলি সমুদায় পোকায় নষ্ট করিল! তলায় এখনও কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু আর কিছু দিন পরে সব মাটী হইবে; অতএব এখন কোন খরিদদার আসিয়া যে দর বলিবে তাহাতেই ছাড়িতে হইবে,—আর রখা হয় না।" এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে কৃষ্ণপান্তী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র আপনার আড়ংঘাটায় আগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে গোহাস্ত কহিলেন, "আমরা সমুদায় ছোলাই বিক্রয় করিব"। কৃষ্ণপান্তী বলিলেন—"আমি দুঃখী, আগে সমস্ত টাকা দিয়া লইবার ক্ষমতা নাই, তবে আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুল্য অবধারণ করিয়া এবং কি পরিমাণে দিবেন তাহার লেখা পড়া করাইয়া

লইয়া সমাস্তক জিনিস দেন তবে আমি বিক্রয় করিয়া আপনাকে টাকা দিতে পারি। আপনার চরণ প্রসাদে আমার কিছু থাকে ভালই। আর আমি দেখিলাম, সমুদায় গোলার দ্রব্যই ২।৩ হাত করিয়া এককালে শস্যহীন হইয়াছে, ঐ গুলা ভূসির দরেই বিক্রীত হইবে। অতএব আমার বিবেচনায় সমস্ত ছোলার দুই দর হওয়া উচিত।" এই কথা শুনিয়া মোহান্ত কহিলেন,—"তুমি অতি ধার্ম্মিক—লেখা পড়ার আবশ্যকতা নাই। আমার মতে উহার এইরূপ মূল্য হওয়া উচিত;—শস্যযুক্ত ভাল মন্দ উভয়েরই প্রতি মণ ৮০ আনা এবং শস্য হীনের প্রতি মণ ৶০ আনা। ইহাতে কিছু লাভ হয় সে তোমার; ক্ষতি হয় বিবেচনা করিব, তোমাকে দায়গ্রস্থ হইতে হইবে না; আমি সমুদায় ছোলাই তোমাকে দিব।" তিনি মোহান্ত ঠাকুরের ঐ কথায় সম্মত ও সন্তুষ্ট হইলেন। পরে, সেই স্থানে আহারাদি করিয়া দুই প্রকার ছোলার নমুনা লইয়া

রাণাঘাটে আসিয়া সেই মহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আসিবার সময় মোহান্ত ঠাকুরের পায় একটী টাকা দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

জিনিস দেখাইয়া মহাজনকে তাহার মূল্যাবধারণ করিতে কহিলেন। মহাজন তাহার তিন প্রকার মূল্য স্থির করিলেন; উত্তমের প্রতি মণ ২৲ টাকা, মধ্যমের ১৷৷০ টাকা এবং তুষির ৷৵০ আনা। কৃষ্ণ পান্তী ইহাতে সম্মত হইলে বায়না পত্র লিখিত এবং বায়নার টাকা প্রদত্ত হইল। তিনি, বায়নার টাকা ও মহাজনকে সঙ্গে লইয়া আড়ৎ ঘাটায় গমন পূর্ব্বক সমস্ত ছোলা মাপাইয়া দিলেন। মহাজন নৌকা বোঝাই করিয়া রাণাঘাটে প্রত্যাগমন করিলেন। হিসাব করিয়া মহাজনের কাছে কৃষ্ণপান্তীর ১৩৮৭৫ টাকা পাওনা হইল। মহাজন অবিলম্বে সমুদায় চুকাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। এস্থলে কৃষ্ণপান্তীর কি লাভ হইল, মোহান্তই বা কি পাইলেন, বিশেষরূপে

জানিবার জন্য বোধ হয়, পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে; এই নিমিত্ত নিম্নে তাহার হিসাব দিলাম।—

উত্তম ছোলা ৩০০০/০ × ২ = ৬০০০
মধ্যম ঐ ৫০০০/০ × ১৷৷০ = ৭৫০০
তুসি ১০০০/০ × ৷৵০ = ৩৭৫
১৩৮৭৫৲

মোহান্তের প্রাপ্য = ৬১২৫৲
কৃষ্ণপান্তীর লাভ = ৭৭৫০৲

মোহান্তের প্রাপ্য।
উত্তম মধ্যম ৮০০০/০ × ৷৵০ = ৬০০০
তুসি = ১০০০/০ × ৷৵০ = ১২৫
৬১২৫

বোধ হয়, ইহাঁর বিষয়ে নিম্ন লিখিত উপাখ্যানটী এই সময়েই কল্পিত হইয়া থাকিবে। তাহা এই, এক দিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণপান্তী বাড়ীর নিকটবর্ত্তী চূর্ণী নদীতে হাত মুখ ধুইতে গিয়াছিলেন। নদীর ধারে এক পরম সুন্দরী কামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময়ে নদী বাহিয়া ৭টী

মুখ-বন্ধ ঘড়া ভাসিয়া যাইতে ছিল। সেই স্ত্রী তাহার মধ্যে একটী তাঁহাকে লইতে অনুরোধ করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। কৃষ্ণচন্দ্র নিকটে যাইবামাত্র ছয়টী ডুবিয়া গেল; কেবল সেই স্ত্রীর নির্দ্দিষ্ট ঘড়াটী ভাসিতে লাগিল। গৃহে আনিয়া দেখেন ঘড়া ধনে পূর্ণ!!

এখন কৃষ্ণ পাল সামান্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, উদার-চরিত্র সোহাক ঠাকুরের অনুগ্রহে যে টাকা লাভ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া কলিকাতা গমন করিলেন। হাটখোলায় একটু জমী পাট্টা লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তত্রত্য ব্যবসায়ি-গণের সহিত প্রণয় হইল, তাহাদিগের দ্বারা ব্যবসায় কার্য্যের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঐ সকলের মধ্যে একজন আত্মীয় বণিকের মুখে শুনিলেন কোম্পানির পোক্তানে লবণ ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ সম্ভাবনা। এই সন্ধান পাইয়া তিনি

কয়েক জন ভদ্র বণিকের সহিত ভাগে লবণ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন এই রূপে যায়।

চিরকাল পরবশ থাকা ভাল লাগে না, কৃষ্ণ পাল্তীর স্বতন্ত্র হইয়া ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্তি হইল। বিনয়-বাক্যে অংশিগণকে অভিপ্রায় জানাইলেন। তাহারা সম্মত হইলে তিনি আপন মূলধন ও লাভাংশ লইয়া পৃথক্ হইলেন। শুনা যায় এবারে ৩০০০০৲ টাকা লাভ পাইয়াছিলেন। এই সময় হইতে দোকানি, পসারি, মুটে, ঘেটেল, গাড়োয়ান প্রভৃতি লোকেরা কৃষ্ণচন্দ্রকে বড় লোক বলিয়া মানিতে লাগিল। স্বয়ং ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞান থাকাতে চারি দিকে সম্ভ্রম বাড়িয়া গেল, জলের ন্যায় পয়সা আসিতে লাগিল। কৃষ্ণচন্দ্র কিছু দিনের মধ্যে ফাঁপিয়া উঠিলেন। সল্টবোর্ডের সাহেবের নিকট তাঁহার এত পসার হইল যে, তাঁহার অনুপস্থিতে অপরেরা

লবণের লাট ক্রয় করিত না, নিলাম (১) বন্ধ থাকিত। ক্রমে এমন হইয়া উঠিল, নিলামের সময় কৃষ্ণ পান্তীর উপর আর কেহই ডাকিয়া উঠিতে পারিত না, কারণ যে যত কেন ডাকুক না কৃষ্ণ পান্তী সকলের উপর ডাকিবেন। শেষে তিনি সাহেবকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে যত ডাকিবে সকলের উপর আমার এক টাকা ডাক রহিল! সুতরাং কৃষ্ণ পান্তী অনুগ্রহ করিয়া না দিলে কেহ এক ছটাক লবণ পাইতেন না। কি! টাকার জোর।

কি বণিকগণ কি পোস্তান ও চৌকির কর্ম্মচারি-গণ সকলেই গতিক দেখিয়া কৃষ্ণ পান্তীর বশীভূত হইল। তিনি কলিকাতার বণিক সম্প্রদায়ের মস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিলেন; তিনি যাহা করিবেন সকলেই তাহা করিবে, তিনি যাহা না করিবেন কেহই

(১) তখন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের লবণ নিলামে বিক্রয় হইত, ওজন কি দর দাম কিছুই ছিল।

তাহা করিবে না। এই সময়ে তিনি হাট-খোলার "কর্ত্তা বাবু" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে না জানিত কলিকাতায় প্রায় এমন লোক ছিল না। এক জন সামান্য দোকানদার হইতে গবর্ণর জেনেরল পর্য্যন্ত সকলেই জানিতেন কৃষ্ণ পান্তী এক জন প্রধান ধনী ও প্রধান বণিক।

ইহার কিছু পূর্ব্বাবধিই মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের পরামর্শে বহু সংখ্যক তালুক ক্রয় করা হইয়াছিল। রাণাঘাট গ্রাম ১২০৬ সালে ক্রয় করা হয়। ইহা পূর্ব্বে কৃষ্ণ নগরের রাজ গণের অধীনে ছিল। কৃষ্ণ পান্তীর জিত পাড় পড়িয়াছিল। যে দিকে চালিতেন সেই দিকেই জয় লাভ হইত! জমীদারী পক্ষেও বিলক্ষণ উন্নতি হইল। ইহাঁর পিতা সহস্র রামের সময়ে ইহাঁদিগের বাটী অতি সামান্য ছিল, বর্ত্তমানে তাহার কোন চিহ্নই নাই, উহা হুগলীর অপর পারে গিয়া পতিত হইয়াছে। এক্ষণে বাস বাটী, উদ্যান

বাটী, গোলাগৃহ, গো-মহিষশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি সকলই অট্টালিকাময় হইল; মহোৎসব বাটী, গুঞ্জবাটী (১) প্রভৃতি পৃথক্২ প্রস্তুত হইল। হস্তী, অশ্ব, রথ, ধ্বজা, নৌকা প্রভৃতি যাহা২ শ্রীমন্তের ঘরে থাকা আবশ্যক, সমুদায়ই প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইল। দান-ধ্যান কর্ম্ম কাণ্ড মহা সমারোহে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। রাজ গুণান্বিত শম্ভুচন্দ্রের প্রতি জমীদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। উপাধি, পাল হইতে 'পাল-চৌধুরী' হইল। তাঁহার দানে লুব্ধ হইয়া নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণেরা রাণাঘাটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই! সমৃদ্ধির সীমা নাই!

(১) যে বাটীতে রথ, রাস, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি হইয়া থাকে। এক্ষণে শ্রীগোপাল পাল-চৌধুরী যে বাটীতে বাস করিতেছেন, উহাই কৃষ্ণ পান্তীর গুঞ্জবাটী ছিল। উমেশচন্দ্র পালচৌ-ধুরীর পুত্রেরা যে বাটীতে বাস করিতেছেন তাহাই মহোৎসব বাটী ছিল।

শুনা যায় তাঁহার আমা স্থায় স্থিত সকলের গদি হইতে বৎসর২ নির্দ্দিষ্ট দিনে লাভের টাকা আসিত। ঐ টাকা রাশীকৃত হইয়া কোন গৃহে তিন চারি দিন রুদ্ধ থাকিত। পরে পরিবারদিগকে আহ্বান করিয়া ঐ গৃহের দ্বার মুক্ত এবং তাহাদিগকে স্ব২ প্রাপ্য বার্ষিক লইতে আদেশ করা হইত। পরিবারেরা আপন২ বার্ষিক গণিয়া লইত না,—কাটা পালি করিয়া মাপিয়া লইত। কেহ এক পালী, কেহ অর্দ্ধ কাঠা, কেহ এক কাঠা,—কেহ বা তদধিক টাকা লইয়া প্রস্থান করিলে অবশিষ্ট কোষসাৎ হইত।

অর্থ এমন জিনিস্ নয় যে, চিরকাল কোন ব্যক্তিকে নিরামিষ রাখে! অর্থাৎ অনেক দিন ধরিয়া অর্থের সহিত কারবার করিলে একটা না একটা অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। কৃষ্ণ পান্তীর নিষ্কলঙ্ক বলিয়া বিখ্যাত চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে আমাদের ক্ষোভ হইতেছে; এই জন্য পুনঃ২

বলিতেছি কৃষ্ণ পান্তী অতি অল্পকালের জন্য সে পাপে রত হইয়াছিলেন, অর্থই সে বিষয়ে দোষী। যে হেতু তখন তাঁহার যেরূপ অবস্থা তাহাতে অন্যায়পথে গমন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, যাহাহউক, জীবন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত বিষয় গোপন করা চরিতাখ্যায়কের কর্ত্তব্য নহে, এই জন্য লিখিতেছি।

কৃষ্ণচন্দ্র দেখিলেন সল্টবোর্ডের সাহেবের তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে; পোক্তান-চৌকী ও হাট বাজারের সকল লোকেই বশীভূত হইয়াছে; সকলেই বড় বলিয়া মানিতেছে; ঘুস্ দিবার টাকারও অপ্রতুল নাই। অতএব তিনি লবণ চুরি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে ভদ্রেশ্বর, কালনা, হাঁসখালি, চাকা, মুরসিদাবাদ, নারায়ণগঞ্জ, সেরাজগঞ্জ, নলহাটী, পাটনা, কাঞ্চন নগর প্রভৃতি স্থানে গদি করিয়াছিলেন। অপহৃত লবণ সেই সকল

স্থানে চালান দিতে লাগিলেন। এবং সেই সেই স্থান হইতে নানা দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী করিতে লাগিলেন। ইহাতে অসম্ভব লাভ হইতে লাগিল। এই রূপে কিছু দিন যায়। কেহ২ বলেন এক দিন ধরা পড়িবার যো হইয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণ পান্তী কিস্তীর তলা ফাঁসাইয়া লবণ জল-মগ্ন করাতে আর কিছুই হয় নাই। শুনা যায়, তিনি ঐরূপ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অধ্যক্ষ সাহেবকে লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে। যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে ইহা বলা অসঙ্গত হয় না যে, উন্নতির সময়ে কৃষ্ণ পান্তী লক্ষ টাকাকে ২।৫ টাকা জ্ঞান করিতেন।

কৃষ্ণ পান্তী নানা প্রকারে দেশের লোকের উপকার করিয়াছিলেন। কাহাকে বাড়ীতে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, কাহাকে বাণিজ্য কার্য্যের ভার দিয়া, কাহাকেও বা নগদ অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ পান্তীর টাকায় যে কত লোক বড় মানুষ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। রাণাঘাটে যত কোঠা দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় তাহার চার আনা কৃষ্ণ পান্তীর টাকার ফল। কেবল রাণাঘাটে কেন? যেখানকার যে ব্যক্তি একবার কৃষ্ণ পান্তীর ছায়া স্পর্শ করিয়াছে সেই ৪।৫ পুরুষের কাজ করিয়া লইয়াছে।

তিনি যাহা বলিতেন তাহাই করিতেন, কখন আপন কথার অন্যথা করিতেন না। এই বিষয়ে তাঁহার এমন সুখ্যাতি ছিল যে, চোর ডাকাইতেও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে ভয় পাইত না। এক দিন কলিকাতা হইতে নৌকা যোগে রাণাঘাট যাইতেছেন। পথে কতক গুলা ডাকাইত তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কয়েক জন নৌকার উপর উঠিয়া লুট পাট ও মারি পীট আরম্ভ করাতে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা আমার গদিতে যাইও খুসী করিব এখন চলিয়া যাও।" তাহারা কর্ত্তা বাবুর কথা

শুনিয়াই চলিয়া গেল। পরে যখন বাসা-বাড়ীতে যায় (তখন সেই দুর্ব্বৃত্তদিগকে শাস্তি দিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়াও কিছুই করিলেন না।) যতগুলি টাকা দিবার মনন করিয়াছিলেন—দিয়া বিদায় করিলেন!!

একখানি তালুক কিনিয়া দিবেন বলিয়া এক দিন কোন ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। পরে উপযুক্ত সময় পাইয়া সেই অঙ্গীকার পালনে উদ্যত হইলে তাঁহার পুত্রেরা "এতালুকে অনেক লাভ আছে; ইহা পরকে দেওয়া উচিত নয়" বলিয়া আপত্তি করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত মনে পুত্রগণকে "আমি যে, তাহাকে দিব বলিয়াছি।" এই কথা বলিয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ, বীর নগরের বর্ত্তমান বামন দাস বাবুর পিতামহ।

তাঁহার সত্যবাদিতা বিষয়ে আরও কিম্বদন্তী আছে। এক দিন এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট অনেক লবণ লইবে বলিয়া একটাকা বায়না দিয়া যায়। কিন্তু টাকার সঙ্গতি

করিতে না পারাতে সে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা বায়নার টাকার দাওয়া করে নাই। কিছু দিন পরেই লবণের দর অত্যন্ত চড়া হয়। তাহাতে কৃষ্ণপান্তী সমুদায় লবণ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যত লবণ খরিদ করিবে বলিয়া বায়না দিয়াছিল, সেই লবণের মুনফা তাহার নামে জমা রাখেন এবং অনেক দিন পরে তাহার দেখা পাইয়া ঐ মুনফার টাকা তাহাকে দেন।

তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। বালক কালে যখন পিতার সঙ্গে গাড়না পুরের হাটে যাইতেন তখন সেখানকার কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বিলক্ষণ স্নেহ করিত, কখন২ মোয়া পাটালি কিনিয়া হাতে দিত। তিনি ইহাতেই এত বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনার উন্নতি কালে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক বাড়ী আনিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং সাধ্য মত আনুকূল্য করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

নিতান্ত ছোট থাকিয়া পরে বড় হইলে

অনেকে অহঙ্কারী হইয়া থাকে। কিন্তু এক সময়ে যিনি পান বেচিয়া কোন রূপে দিন পাত করিতেন, এক্ষণে সেই কৃষ্ণপান্তী টাকার পর্ব্বতে বসিয়াও সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সামান্য কাপড় পরিতেন, সামান্য বিছানায় বসিতেন—সামান্য রূপ আহার করিতেন—জিনিসের নমুনা কাপড়ে বাঁধিয়া হাট বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আপনার আবশ্যক কার্য্য আপনিই করিতেন—দাস দাসীর অপেক্ষা ছিল না। ফলে তিনি কার্য্যে অসমর্থ হইবার জন্য বাবু হয়েন নাই। এক দিন স্বয়ং গাড়ু হাতে বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া বাবু শম্ভুচন্দ্র গাড়ু ধরিবার খানসামা, আরদালী বরকন্দাজ প্রভৃতি পাঠাইয়া দেন। তিনি তাহাতে শম্ভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি যে, সামান্যভাবে থাকিতেন তাহার আরও একটী গল্প না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার নাম সম্ভ্রমের অনুরূপ শরীর-শ্রী ছিল না। দেখিতে অতি

কুৎসিত ছিলেন, দেখিয়া কৃষ্ণপান্তী বলিয়া চিনিতে পারা যায় এরূপ কোন লক্ষণই ছিল না। তিনি দীর্ঘাকার একহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন; ছোট কাপড় পরা গলায় দানা ছিল, এক দিন এই ভাবে হাট খোলার গঙ্গা তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিলেন নিকটে বহু সংখ্যক কিস্তী লাগিয়াছে, মহাজন ও মাজিরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছে। তিনি এক জন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জিনিস? কত আছে? দর কি?" মহাজন কৌতুক করিয়া জিনিস্ যত ছিল অনেক কমাইয়া বলিল; যাহার দর ৫ টাকা তাহা ২টাকা বলিল। কৃষ্ণপান্তী তৎক্ষণাৎ বায়না দিয়া বাসায় গেলেন। মহাজন বায়নার টাকা হাতে করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু যখন শুনিল যে, যাঁহার হস্ত হইতে বায়না লইয়াছে তিনি হাট খোলার কর্ত্তা বাবু, তখন কাঁপিতে২ বসিয়া পড়িল, মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরে সকলে যুটিয়া গদিতে গেল, এবং অনেক

কাঁদা কাটি করিয়া বিনয় পূর্ব্বক বায়নার টাকা ফিরাইয়া দিল।

তিনি কখন মিথ্যা কহিতেন না, আপন ধর্ম্মের প্রতি অকপট ভক্তি করিতেন। এক সময়ে কোন ব্যক্তি টাকা পাইবে বলিয়া কাহারও নামে আদালতে লালিস করিয়া তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছিল। হলপ্ করিয়া সত্যই বল আর মিথ্যাই বল উভয়ই হিন্দু-ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এই সংস্কার থাকায় তিনি বিচার স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ফরীয়াদী টাকা পাইবেন সত্য, আমি সেই টাকা দিতেছি, হলপ করিতে পারিব না।" ইহাতে বিচার কর্ত্তারা বিস্মিত হইয়া সেই অবধি প্রচার করিয়া দিলেন যে, আর কেহ কৃষ্ণপান্তীকে সাক্ষী মানিতে পাইবে না।

বিষয় বুদ্ধি এত প্রবল ছিল, একদিন জয়রাম ন্যায় পঞ্চানন নামক কোন সংস্কৃত অধ্যাপককে কহিয়াছিলেন, "পড়ানতে বছরে তোমার কত মুনফা হয়?" তাহাতে সেই অধ্যাপক আপন ব্যবসায়ে অধিক লাভ

নাই বলিয়া দুঃখ করাতে কহিলেন, "তুমি এ ব্যবসায় ছাড়িয়া দেও, আমি টাকা দেই অন্য কারবার কর বেশ লাভ হইবে।"

প্রচুর ধন দেখিয়া কোম্পানি তাঁহাকে রাজা উপাধি দিতে চাহিলেন; কিন্তু রাজা হইলে পাছে লুণের গোলায় যাইতে না পারেন এই জন্য তাহা অস্বীকার করিলেন।

একবার পূজার সময় যেদিন আসিবার কথা সেদিন না আসিয়া পরদিন বাড়ী আইলেন। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিলেন,—"লাক টাকা রোজগার করে থুয়ে এলাম।"

ক্ষোভের বিষয় এই, যাঁহার এত ঐশ্বর্য্য একটী সামান্য পুষ্করিণী ব্যতীত সাধারণের উপকারের নিমিত্ত তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি কিছুই নাই। এবং যাহার এত মহৎ গুণ তিনি দুইবার অন্যায় পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। একবারের কথা বলা হইয়াছে; আর একবার ভ্রাতুষ্পুত্র বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত ভাগাভাগী সম্বন্ধে কিছু হয়। তাঁহার ধর্ম্ম-

বুদ্ধি বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ উপাখ্যান শুনা যায়।

নিম্ন লিখিত আখ্যায়িকার দ্বারা তাঁহার আতিথেয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পিতার মৃত্যুর পর, এক দিন গাংনাপুরের হাটে যাইবেন বলিয়া প্রত্যুষে স্নান করিতে যাইতেছেন, পথে একটী জরতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,—"বাবু, কৃষ্ণ পাণ্ডীর বাড়ী কোথায়,—আমি এবেলা সেই স্থানে অবস্থিতি করিব।" ইহাতে তিনি পরম আদরে তাঁহাকে বাটী পাঠাইয়া দিয়া সত্বর স্নান করিয়া আসিলেন। বাটী আসিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা ঠাকুরাণীকে কোথায় বসিতে দিয়াছ?" তিনি তাঁহাকে যে ঘরে বসিতে দিয়াছিলেন নির্দ্দেশ করিয়া বলিলে কৃষ্ণচন্দ্র সেই ঘরে গিয়া দেখিলেন তথায় কেহই নাই,—কেবল ধূনা গুগ্‌গুলাদির গন্ধে গৃহ আমোদিত রহিয়াছে! ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া সেই ঘরে কোন রূপ অত্যাচার না হয় এই বিষয়ে জননীকে

অনুরোধ করিয়া হাটে গেলেন। তদবধিই তাঁহার উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। কৃষ্ণ পান্তীর, যখন অতিথিকে অন্ন দিবার সঙ্গতি ছিল না তখন তাঁহার অতিথির প্রতি ভক্তি ছিল; কিন্তু সেই ভক্তি তাঁহার উন্নতাবস্থায় ছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই; যে হেতু অদ্যাপি তাঁহার বংশীয় যত গুলি পাল চৌধুরী রাণাঘাটে আছেন—সাধারণ অতিথি সেবা কাহার বাড়ীতেই নাই।

আমরা শুনিতে পাই, সব প্রথমে ব্যবসায় করিবার জন্য জননী তাঁহাকে একটী আধুলি দিয়াছিলেন। তিনি সেই একটী মাত্র আধুলি মূল ধন লইয়া শেষে এত টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি কেমন হিসাবী ছিলেন ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই নিমিত্তই অনেকে তাঁহাকে এক আধুলির বড় মানুষ বলিয়া থাকে। পাঠক, যদি সৌভাগ্য কাহাকে বলে জানিতে চাও;—যদি "ছাই মুটাটা ধরিলে সোণা মুটাটা হয়"

ইহার উদাহরণ দেখিতে চাও কৃষ্ণ পান্তীকে দেখ!

এক সময়ে তাঁহারই বংশীয় কোন ব্যক্তি বহু সংখ্যক টাকার গুড় ক্রয় করিয়াছিলেন। ক্রয়ের অব্যবহিত পরেই গুড়ের বাজার অত্যন্ত নরম হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে তিনি যার পর নাই চিন্তিত হয়েন। এমন সময় কৃষ্ণ পান্তী সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন,—ব্যবসায়ে লাভ করা তোমার কর্ম্ম নহে,—সমুদায় গুড় কেনা-দরে আমাকে দেও।" তখন যেরূপ বাজার, প্রথম ব্যক্তি কেনা-দরে ছাড়িতে পাইয়াই আপনাকে লাভবান বোধ করিলেন। কৃষ্ণ পান্তী নরম বাজারে অধিক মূল্যে গুড় কিনিয়া বাড়ী যাইবামাত্র কলিকাতা হইতে সম্বাদ পাইলেন,—যে গুড় বিলক্ষণ মহার্ঘ হইয়াছে। সুতরাং সেই গুড় ছাড়িয়া প্রচুর লাভ করিলেন।

কৃষ্ণ পান্তীর উপাখ্যান, অদ্ভুত উপন্যাসের ন্যায় অবাক্ হইয়া শুনিতে হয়।

সমুদায় লিখিতে গেলে এক খানি স্বতন্ত্র পুঁথি হইয়া উঠে। অতএব এই স্থানেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করা গেল।

যাহা হউক, তিনি বালক কাল হইতে ষাইট বর্ষ পর্য্যন্ত এইরূপে জীবন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১২১৬ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি ভাল লেখা পড়া জানিতেন না কিন্তু মূর্খও ছিলেন না।

যাহারা এক্ষণে নদীয়া জিলার প্রধান জমীদার বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহারা বাবুগিরির চূড়ান্ত করিতেছেন,—যাঁহাদের ঘর-দ্বার বাগ-বাগিচা দেখিলে ইন্দ্রের অমরাবতী মনে পড়ে, জাঁক জমক শ্রী ছাঁদ দেখিয়া যাঁহাদিগকে স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া বোধ হয়,—যাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়াও রাজ-লক্ষ্মীকে তাড়াইতে পারিতেছেন না; কৃষ্ণ পান্তীই রাণাঘাটের সেই পাল চৌধুরীদিগের এত সমৃদ্ধির মূলাধার।

এক কালে যিনি দুই কড়ার মুড়ির মোয়া পাইয়া সন্তুষ্ট হইতেন, যিনি পানের বোঝা

মাথায় করিয়া হাট করিয়া বেড়াইতেন, যিনি বলদের পীঠে ছালা চাপাইয়া দেশে২ চাল ধান বেচিয়া বেড়াইতেন, যিনি ধূলা মাখা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া দীন বেশে দিন কাটাইতেন,—কেবল সেই কৃষ্ণ পান্তীর পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, উৎসাহ, বিষয়-বুদ্ধি এবং সত্য-নিষ্ঠাই রাণাঘাটের পাল চৌধুরী দিগের ঈদৃশী উন্নতির নিদান।

—••—

রাজা রামমোহন রায়।

—●●●—

যিনি, বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আমরা শ্লাঘা করিয়া থাকি,—যিনি মানুষের হিত করিবেন বলিয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; এক্ষণে সংক্ষেপে সেই মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিত হইতেছে।

ইনি, ১১৮১ সালে বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা রাধানগরের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। ঐ গ্রাম ইহাঁদের পূর্ব্ব নিবাস নহে। দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান রাজার উপদ্রবে তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় মুরসিদাবাদ পরিত্যাগ করত এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে আসিবার কারণ;—বর্দ্ধমান জেলা অতি উত্তম স্থান এবং ঐ জেলায় রামকান্তের পৈতৃক ভূম্যাদি ছিল।

মুরসিদাবাদও ইহাঁদের প্রকৃত নিবাস নহে। রামমোহন রায়ের পিতামহ নবাব সংসারে কোন প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া মুরসিদাবাদ আসিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি ঐ চাকরী সূত্রে পরিবারাদি লইয়া মুরসিদাবাদে এক প্রকার বাসই করিয়াছিলেন।

মনুষ্যদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু যে সময়ে আরেঙ্গেব নামে এক জন গোঁড়া মুসলমান দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া হিন্দুগণের প্রতি সরোষ দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। আবার ইঁহারই অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রামমোহন রায় চাকরীর মুখে জলাঞ্জলি দিয়া কর্ম্ম স্থান পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। তাঁহার স্বলিখিত আত্ম-বৃত্তান্তে দেখা যায়, চাকরী ব্যবসায় তাঁহাদের বংশে ১৪০ বৎসরের অধিক প্রচলিত ছিল না।

রাজা রামমোহন রায়।

—●●●—

যিনি, বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আমরা শ্লাঘা করিয়া থাকি,—যিনি মানুষের হিত করিবেন বলিয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; এক্ষণে সংক্ষেপে সেই মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিত হইতেছে।

ইনি, ১১৮১ সালে বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা রাধানগরের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। ঐ গ্রাম ইহাঁদের পূর্ব্ব নিবাস নহে। দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান রাজার উপদ্রবে তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় মুরসিদাবাদ পরিত্যাগ করত এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে আসিবার কারণ;—বর্দ্ধমান জেলা অতি উত্তম স্থান এবং ঐ জেলায় রামকান্তের পৈতৃক ভূম্যাদি ছিল;

মুরসিদাবাদও ইহাঁদের প্রকৃত নিবাস নহে। রামমোহন রায়ের পিতামহ নবাব সংসারে কোন প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া মুরসিদাবাদ আসিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি ঐ চাকরী সূত্রে পরিবারাদি লইয়া মুরসিদাবাদে এক প্রকার বাসই করিয়াছিলেন।

মনুষ্যদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু যে সময়ে আরেঞ্জেব নামে এক জন গোঁড়া মুসলমান দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া হিন্দুগণের প্রতি সরোষ দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। আবার ইঁহারই অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রামমোহন রায় চাকরীর সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কর্ম্ম স্থান পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। তাঁহার স্বলিখিত আত্ম-বৃত্তান্তে দেখা যায়, চাকরী ব্যবসায় তাঁহাদের বংশে ১৪০ বৎসরের অধিক প্রচলিত ছিল না।

বালকগণ, তোমরা এমন মনে করিও না যে, সামান্য পাঠশালায় লেখা পড়া করিলে বড় লোক হইতে পারে না। আপনার শ্রম এবং যত্নই বড় হইবার প্রধান কারণ। জগদ্বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় প্রথমে শিখিবার জন্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। অতি পূর্ব্বকালের কথা বলিতেছি না,—রামমোহন রায়ের সময়ে গুরু মহাশয়দিগের যত বিদ্যা ছিল তাহার প্রমাণ অদ্যাপি হাতেং পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের যত্নে ছেলেদের যত হিত হইত, তাহার অপেক্ষা অহিত অধিক হইত। যে ছেলের কথা হইতেছে গুরু মহাশয় দ্বারা তাঁহার কিছুই অনিষ্ট হয় নাই। যেমন অঙ্গারে ফেলিয়া দিলেও আগুণ সতেজে প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই রূপ তাদৃশ কুশিক্ষা ও কুসংসর্গের মধ্যে থাকিয়াও রামমোহন রায়ের বুদ্ধির স্বাভাবিক জ্যোতিঃ সমভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন কিছু চাপা পড়িলেও বাঁশের কোঁড় তাহা-

দিগকে পাশে ফেলিয়া উঠিয়া থাকে, সেই রূপ রামমোহন রায় অযোগ্য শিক্ষালয়ের সমুদায় দোষ অধঃকৃত করিয়া উন্নত হইতে লাগিলেন। তিনি এইখানে থাকিয়াই বঙ্গভাষা একরূপ শিখিয়া ফেলিলেন।

এখনকার বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও অনুশীলনের সঙ্গে তুলনা করিলে রামমোহন রায়ের সময়ে কিছুই ছিল না বলিলে হয়। তখন সংস্কৃত ভাষাধ্যায়ী ২।৪ জন ব্যতীত অপরে বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় শুদ্ধ করিয়া বলিতে বা লিখিতে পারিত না। কিন্তু রামমোহন রায় সেই সময়ে আপন শ্রম ও বুদ্ধিবলে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ শিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে হয়। বাঙ্গালা শিক্ষার পর রামকান্ত রায়, আরবী ও পারসী শিখাইবার জন্য তাঁহাকে পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। এখন যেমন ইংরাজী জানিলে বড়২ কর্ম্ম হয় ও রাজপুরুষদিগের

নিকট আদরণীয় হওয়া যায়; তখন আরবী ও পারসী জানিলেও সেই রূপ হইত। রামমোহন রায় কিছু দিন মন দিয়া এই দুই ভাষা ও উহাতে অনুবাদিত গ্রীক্‌দিগের ভালং গ্রন্থ পাঠ করিলেন। বিশেষতঃ ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব ও আরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র পড়িয়া বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর ও সুমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি যে পথ ধরিয়া ভুবন ব্যাপী যশোলাভ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জনপদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, মহম্মদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার মন সেই পথের পথিক হইয়াছিল। অর্থাৎ পৌত্তলিক ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও একেশ্বরে বিশ্বাস হইল।

পরে আরবী ও পারসী পাঠ সম্পন্ন করিয়া সংস্কৃত পড়িবার জন্য বারাণসী গমন করিলেন। সেখানে থাকিয়া বড়ং অধ্যাপকগণের নিকট অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করাতে কিছু দিনের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ অধিকার হইল। বেদ পুরাণ

প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করাতে ক্রমেং আপন মত দৃঢ় হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মন স্বভাবতঃ যে ধর্ম্মের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, আমাদিগেরই প্রাচীন-মুনিগণ কর্ত্তৃক বেদ পুরাণে সেই ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া ১১৯৭ সালে ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী" বলিয়া একখানি পুস্তক লিখিলেন। পৌত্তলিক ধর্ম্ম মিথ্যা, উহা অবলম্বন করিলে ভাল না হইয়া মন্দ হয়, অতএব তাহা ত্যাগ করা উচিত, ঐ গ্রন্থে এই সকল বিষয় উপযুক্তরূপ যুক্তি ও প্রমাণের সহিত লিখিত হইয়াছিল। উহা হিন্দু-সমাজে প্রচারিত হইবামাত্র একেবারে চারি দিকে দ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল। মহাত্মা রামমোহন রায় তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; অম্লান-বদনে সেই অনল-তাপসহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু পৌত্তলিক

ধর্ম্মাবলম্বী পিতা রামকান্ত রায়ের দ্বেষ ও অবজ্ঞায় তাঁহাকে ঘর ছাড়িতে হইয়াছিল।

তিনি প্রথমে ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে গমন করিয়া কোথায় কিরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে উত্তম রূপে দেখিতে এবং কিরূপে ব্যক্তিগণকে স্ব২ জঘন্য ধর্ম্মের ঘৃণিত হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন তাহারই পথ দেখিতে লাগিলেন। তিনি যে, কেবল স্বদেশের ধর্ম্ম সংশোধনে সযত্ন হইয়াছিলেন এমন নহে, কিরূপে পৃথিবীর সমস্ত লোক বিমল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অমৃতাস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইবে সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতেন। ধর্ম্ম সংশোধনরূপ গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে হইলে যে সকল মহৎ গুণ আবশ্যক হয়, রাম মোহন রায়ের সে সমুদায়ই ছিল। নানা দেশের নানা শাস্ত্রে জ্ঞান-সাহস-দয়া-শ্রমশক্তি-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল ছিল না।

ভারতবর্ষ দেখা হইলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জানিবার জন্য তিব্বতে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন তাহারা কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেছে। তিনি নির্ভয় চিত্তে বৌদ্ধ ধর্ম্মের দোষ দেখাইয়া তাহাদিগকে যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু বানরের প্রতি পক্ষী উক্তির ন্যায় সে উপদেশে আপনারই অনিষ্ট ঘটিতে লাগিল। তিব্বত বাসীরা রামমোহন রায়ের কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। কিন্তু তিনি লোকের দ্বেষ-অত্যাচার-তিরস্কার অঙ্গের আভরণ জ্ঞান করিতেন, লোকের ভাল করিতেছেন এই দৃঢ় নিশ্চয়ে বরং সন্তুষ্ট হইতেন। সুতরাং তিনি যে, দূরস্থিত তিব্বত দেশে থাকিয়া তাহাদিগের অত্যাচারে আপনাকে বিপদাপন্ন জ্ঞান করেন নাই তাহা বলা অধিক। তিনি তিব্বতের যে বাড়ীতে বাস করিতেন সেই বাড়ীর কয়েকটী স্ত্রীলোক বরাবর তাঁহার পক্ষতাবলম্বন করিয়াছিল, তিব্বত বাসিদিগের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা

করিবার জন্য তাহারা সবিশেষ চেষ্টা করে। উক্ত অঙ্গনাগণ তাঁহার সৎকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া তিনি যাবজ্জীবন স্ত্রীলোকের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। এইরূপে প্রায় চারি বৎসর দেশে২ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

বাইশ বৎসর বয়সের সময় ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার মন ধর্ম্ম চিন্তায় একান্ত আসক্ত ছিল বলিয়া ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে অধিক সময় ও আয়াস লাগিয়াছিল। ফলে শেষে তিনি এই ভাষা এমন উত্তম রূপে শিখিয়াছিলেন যে, উহাতে বড়২ অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সাহেবেরা বাঙ্গালীর ইংরাজী শিক্ষার প্রশংসা প্রায় করেন না; কিন্তু অনেক প্রধানং সাহেব রামমোহন রায়ের ইংরাজী ভাষার ব্যুৎপত্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অসাধারণ শ্রম ও উৎসাহ বলে ক্রমে সংস্কৃত, আরবী, পারসী, বাঙ্গালা, হিন্দী, হিব্রু,

গ্রীক্, লাটিন্, উর্দ্দু এবং ইংরাজী এই কয়েক ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও ২।১ টী ভাষায় কার্য্যোপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

যিনি এত দিন অনন্য কর্ম্মা হইয়া কেবল বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছিলেন, ১২১০ সালে পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাকে পরিবারের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে হইল। তিনি পৈতৃক বিষয়ের যে তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত না, এই জন্য রঙ্গপুর জিলার কালেক্টারীতে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কালেক্টর ডিগ্‌বী সাহেব ভদ্র ও গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া রামমোহন রায় অন্যান্য আমলাগণের অপেক্ষা সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিতে পাইতেন এবং ঐ সাহেবের সহিত প্রণয় হওয়াতে তাঁহার নিকট আরও ইংরাজী পড়িতে লাগিলেন। যাহা হউক, তখন বাঙ্গালিদিগের যাহা হইতে আর উচ্চ পদ প্রায় হইত না,

রামমোহন রায় অতি শীঘ্র সেই সেরেস্তাদারী কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। এই কর্ম্মে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এবং কয়েক বৎসর পরে অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাদের পুত্রাদি না থাকায় তিনি পৈতৃক সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই বিষয় হস্তগত করিতে তাঁহাকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কারণ তাঁহার দায়াদগণ, রামমোহনরায় জাতিচ্যুত হইয়াছেন—পৈতৃক বিষয়ে তাঁহার অধিকার নাই বলিয়া আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিল। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আদালত ও জ্ঞাতিবর্গকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার জাতি যায় নাই। সুতরাং তখন আর তাঁহার বিষয় প্রাপ্তির অন্য কোন বাধা থাকিল না। ঐ মোকর্দ্দমায় তাঁহার অনেক অর্থ ও অনেক সময় লাগিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের হিতোদ্দেশে যে কোন কার্য্য করিতে হয়, সকলেই প্রচুর

অর্থের আবশ্যকতা আছে। এই নিমিত্তই ঐ বিষয় প্রাপ্তির জন্য এত যত্ন করিয়াছিলেন।

এই রূপে বিপুল বিভব হস্তগত হওয়াতে তিনি চাকরী ছাড়িয়া পুনরায় মুরসিদাবাদে গমন করিলেন এবং তথায় থাকিয়া "পৌত্তলিকতা সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ" এই নাম দিয়া পারসী ভাষায় এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। পরে ১২২১ সালে কলিকাতায় আগমন করিলেন। নগরের কোলাহল ও বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে অবস্থিতি পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার যে বাসনা চিরকাল তাঁহার অন্তঃকরণে ছিল, এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ করিলেন। কলিকাতার পূর্ব্বদিকে সারকুলার রোডে একটী অতি সুন্দর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন, এই বাটীর চারি দিকে ফুলের বাগান ছিল,—এই সময়ে তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর।

মহাত্মা রামমোহন রায় এই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কেবল নির্ম্মল

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যতগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন, প্রায় সেই সমুদায়েই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া সমস্ত লোককে বিতরণ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টানদিগের বাইবেল হইতে উত্তম২ নীতি সকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যেরূপ অর্থ ব্যয়, পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। "পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর জীবন।" এই কথার মহত্ত্ব কেবল তিনিই বুঝিয়াছিলেন। তিনি নিজ ক্ষমতা, অর্থ ও জীবন পরোপকার-রূপ মহা ব্রতেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয়! এই সময়ে কি হিন্দু কি বৌদ্ধ কি খৃষ্টান কি মুসলমান সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। কিন্তু যেমন সহস্রং তরঙ্গ লাগিলেও শৈল বিচলিত হয় না সেইরূপ তাঁহার একাগ্র অন্তঃকরণ মহৎ বিশ্বাস হইতে কিছুতেই চলিত হইল না; ভয় শূন্য স্থির-চিত্তে কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে অনেক দিন গত হইলে তাঁহার বহুযত্ন প্রতিপালিতা আশালতায় ফল জন্মিল; সত্যের বিমল জ্যোতিঃ অনেকের মনের অন্ধকার নষ্ট করিল। এই সময় অনেকগুলি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক তাঁহার দিকে আসিয়া, কিরূপে সাধারণে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রশস্ত-পথে আগমন করিবে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় ইহাদিগকে লইয়া ১২৩৪ সালে কলিকাতার কমল্ বাবুর বাড়ী একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। এই সময়ে সমাজের সভ্য চারি পাঁচজনের অধিক হইত না এবং রামমোহন রায়কে প্রাণের ভয়ে নিকটে অস্ত্র রাখিতে হইত। যাহাহউক ঐ সমাজই অদ্যাপি কলিকাতায় বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার মহামহিম নামকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত সকলেরই স্মরণ-পথে আনয়ন করিতেছে। এই সভা প্রতি বুধবারে বসিয়া থাকে। উপাসকেরা প্রথমে পর ব্রহ্মের উপসনা করেন,—পরে সমাজ ও

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যতগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন, প্রায় সেই সমুদায়েই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া সমস্ত লোককে বিতরণ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টানদিগের বাইবেল হইতে উত্তমং নীতি সকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যেরূপ অর্থ ব্যয়, পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। "পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর জীবন।" এই কথার মহত্ত্ব কেবল তিনিই বুঝিয়াছিলেন। তিনি নিজ ক্ষমতা, অর্থ ও জীবন পরোপকার-রূপ মহা ব্রতেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয়! এই সময়ে কি হিন্দু কি বৌদ্ধ কি খৃষ্টান কি মুসলমান সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। কিন্তু যেমন সহস্রং তরঙ্গ লাগিলেও শৈল বিচলিত হয় না সেইরূপ তাঁহার একাগ্র অন্তঃকরণ মহৎ বিশ্বাস হইতে কিছুতেই চলিত হইল না; ভয় শূন্য স্থির-চিত্তে কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে অনেক দিন গত হইলে তাঁহার বহযত্ন প্রতিপালিতা আশালতায় ফল জন্মিল; সত্যের বিমল জ্যোতিঃ অনেকের মনের অন্ধকার নষ্ট করিল। এই সময় অনেক গুলি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক তাঁহার দিকে আসিয়া, কিরূপে সাধারণে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রশস্ত-পথে আগমন করিবে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় ইহাদিগকে লইয়া ১২৩৪ সালে কলিকাতার কমলু বাবুর বাড়ী একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। এই সময়ে সমাজের সভ্য চারি পাঁচজনের অধিক হইত না এবং রামমোহন রায়কে প্রাণের ভয়ে নিকটে অস্ত্র রাখিতে হইত। যাহাহউক ঐ সমাজই অদ্যাপি কলিকাতায় বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার মহামহিম নামকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত সকলেরই স্মরণ-পথে আনয়ন করিতেছে। এই সভা প্রতি বুধবারে বসিয়া থাকে। উপাসকেরা প্রথমে পর ব্রহ্মের উপসনা করেন,—পরে সমাজ ও

প্রত্যেক ব্যক্তির উপকারী নানাবিধ নীতি বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ ও শেষে রামমোহন রায়ের কৃত উত্তমোত্তম ব্রহ্ম সংগীত করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও নানাবিধ বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ জন সমাজে প্রকাশ করিবার জন্য এই সভা হইতে অনেক পুস্তক ও পত্রিকা লিখিত হইয়া থাকে। যে সে এই সভায় আসিয়া উপসনা করিতে ও উপদেশ শুনিতে পারে তাহার বারণ নাই।

এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে দেশ-প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম যে এক চেটিয়াছিল তাহা ঘুচিয়া গেল; অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা ভালং ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিবেন—উত্তমং মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিবেন, কিন্তু শূদ্রেরা তাহা পারিবেন না—বড় জোর তাঁহারা দুই একবার কালী নাম কি কৃষ্ণ নাম করিতে পাইবেন, গায়ত্রী কি বেদ-সম্মত অন্যরূপ উপসনার কাছেও যাইতে পাইবেন না। এখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই এক পথে দাঁড়াইয়া জগৎ পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন দেখিয়া দেশের কতক

গুলি কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ক্রোধে অন্ধ হইয়া দ্বেষে জ্বলিতে লাগিলেন। যাহাতে ব্রাহ্মগণ অপদস্থ হয়—ব্রাহ্ম-সভা উঠিয়া যায়, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মিথ্যা ও একাকারের মূল বলিয়া সকলে জানিতে পারে এই উদ্দেশে তাঁহারা "ধর্ম্ম সভা" নামে অপর একটা সভা স্থাপন করিলেন। কিছু দিন এই দুই দলে ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে উভয় পক্ষই এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, কোন্ পক্ষে জিত হইবে তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত সহজে বুঝিতে পারা যায় নাই। শেষে ব্রাহ্ম সভারই জয় লাভ হইল। কাজে কাজেই ধর্ম্ম-সভাকে দণ্ডাহত বিষধরের ন্যায় মাথা নোয়াইতে হইল।

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এদেশে সতীদাহের ভয়ানক প্রথা প্রবল ছিল। শত শত হিন্দুকামিনী মৃত পতির জ্বলচ্চিতায় প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিত। "এই রূপ করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, এবং ঐ পতির সঙ্গেই স্বর্গ রাজ্যে সুখভোগ করিতে

পারা যায়।" প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের এই কথায় দেশীয় লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সকল স্ত্রীই যে, ঐ বিশ্বাসের বশে সহগামিনী হইত এমন বলা যাইতে পারে না। যাহারা পতির প্রতিকূলা ও দুঃশীলা, তাহারাও পুরাতন কলঙ্ক নাশ ও সতী বলিয়া খ্যাতি-লাভের নিমিত্ত পতির চিতারোহণ করিত। শুনা যায় যে, যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া পাছে চিতা হইতে পলায়ন করে এই আশঙ্কায়, সহগামিনী স্ত্রীর আত্মীয়বর্গ তাহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিত,—চারি-দিকে মহাশব্দে ঢাক বাজিত—দর্শনকারীরা মাঝে২ জাঁকাইয়া হরিবোল দিত। "কাহা-রও সর্ব্বনাশ, কাহার ভাদ্রমাস।"

হিন্দু-শাস্ত্রের এই ভীষণ শেল রামমোহন রায়ের হৃদয় হাসয় বিদ্ধ করিল। উহার নৃশংসতায় পরিপীড়িত হইয়া যাহাতে এই ভয়ঙ্করী জীবঘাতিনী রীতি দেশ হইতে দূর হয়, বিশেষরূপে তাহার চেষ্টা করিতে লা-গিলেন। প্রথমে, ইহাতে স্ত্রীগণের ধর্ম্ম

নাই, প্রধান২ ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার বিধি নাই, ইহা সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্ম ও যুক্তি বিরুদ্ধ, এই বিষয়ে বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তি যুক্ত গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গবর্ণর-জেনেরল লার্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতেই সহগমন উঠাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ক-ল্পনা হইতেছিল, কিন্তু সহগমন নিবারণ করিলে পাছে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয় এই শঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট কৃতকার্য্য হইতে পা-রেন নাই। এক্ষণে রামমোহন রায়ের লি-খিত গ্রন্থরূপ অস্ত্র দ্বারা লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহা-দুর নির্ভয়ে সহগমন প্রথারূপ ভয়ঙ্করী রাক্ষ-সীর শিরশ্ছেদ করিলেন। অতএব মহা মহোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের যত্নই এই কদর্য্য প্রথা নিবারণের প্রধান কারণ বলিতে হইবে। এই শুভ কর্ম্ম ১২৩৬ সালে সম্পন্ন হয়। ইহার পর এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ঐ দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে নাই; কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে দুই একটী স্ত্রী অদ্যাপি ঐরূপ সহমৃতা হইয়া থাকে।

যে সময়ে সহগমন উঠাইবার জন্য রাজ-নিয়ম প্রকাশ হইল, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম সভা একবার কোলাহল করিয়া উঠেন। তাঁহারা নিজে এবং কতকগুলি প্রাচীন হিন্দুর স্বাক্ষর করাইয়া যাহাতে সহগমন প্রথা রহিত না হয়, এই বিষয়ে এক আপত্তি পত্র লিখিয়া বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। এ দিকে, রামমোহন রায়ও, দ্বারকানাথ ঠাকুর কালীনাথ রায় প্রভৃতি কতিপয় বড়২ লোকের স্বাক্ষর করাইয়া বেণ্টিঙ্ক মহোদয়কে দেশের পরম উপকারী বলিয়া এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। ধর্ম্মসভার প্রতিবাদ পত্র অগ্রাহ্য হইল। যেমন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় দেখিয়া তারাগণ একে২ অন্তর্হিত হয়, সেই রূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ দেশ মধ্যে বিকীর্ণ হওয়াতে ধর্ম্ম-সভার সভ্যগণ একে২ গা ঢাকা হইলেন। এক্ষণে কখন২ সেই সভার নাম মাত্র শুনা যায়।

বিদ্যা, ধন, সভ্যতা ও রাজনীতি বিষয়ে

যে স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রধান হইয়াছে, রাজা রামমোহন রায় অনেক দিন হইতে সেই বিলাত গমনে অভিলাষী ছিলেন। এক্ষণে সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে, বিলাত গমন করিয়া রামমোহন রায় জাতিভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছেন শুনিয়া দেশীয় লোকেরা একেবারে চারিদিক হইতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় কখনই সাধারণ মতে উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই। সহিষ্ণু ও অবিরক্ত চিত্তে তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ দূরীকরণে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। এখনও, পোতারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র বা বিদেশ গমনে জাতি যায় না, পরম যত্নে সাধারণকে তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন। কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ে উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের সংস্রব ত্যাগ করাকে তিনি সাহস ও পৌরুষ মনে করিতেন না; তাঁহার বোধ ছিল, দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক মানুষের চরিত্র সংশোধন করাই

সৎসাহস ও মনুষ্যত্বের লক্ষণ। তিনি আরও ভাবিতেন যে, সাধারণকে পরিত্যাগ করিয়া যতদূরে যাইবেন, অভীষ্ট সাধনে ততই অকৃত-কার্য্য হইবেন। হিন্দু-সমাজ সংশোধন বিষয়ে তিনি প্রধানরূপে এই অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, সাধারণ মতের সহিত স্বমতের যে পরিমাণে ঐক্য স্থাপন করিতে পারিবেন, আপন মত সেই পরিমাণেই কার্য্যকারী হইবে। রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতের এই অংশে সমাজ-ত্যাগেচ্ছু ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক, যাহাহউক, তিনি সাধারণকে এক রূপ সম্মত করিয়াই সমুদ্র গমনেকৃত সংকল্প হইলেন।

এই মহত্তর মনোরথ সম্পন্ন করিতে তাঁহাকে অধিক ভাবিতে ও কষ্ট পাইতে হয় নাই। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যেমন পদে২ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, তেমনি সময়ে২ অতর্কিত রূপে সুযোগও উপস্থিত হয়। তিনি ইংলণ্ডীয়দিগের চরিত্র, রীতি, সভ্যতা,

ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন এবং সেই স্থানে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিবেন, ইহাই তাঁহার ইংলণ্ড গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট, "বোর্ড আর্ কণ্ট্রোল" নামক ইংলণ্ডের রাজকীয় প্রধান সমাজে আপনার কোনরূপ প্রার্থনা জানাইতে ইংলণ্ডে পাঠাইবার জন্য এক জন উপযুক্ত দূত অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। সেই সময়ে রামমোহন রায় সর্ব্ব বিষয়ে সুযোগ্য ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকেই মনোনীত করিয়া রাজা উপাধি প্রদান পূর্ব্বক পরম যত্নে বিলাত পাঠাইলেন। তদনুসারে তিনি ১২৩৭ সালে ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

যখন সমুদ্রে বাতাস প্রবল হইয়া ঝড় উঠিত, পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালায় জাহাজ আন্দোলিত করিত, এবং জাহাজের অন্যান্য লোকেরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিত, তিনি সেই সময়ে বিছুমাত্র ভীত না হইয়া পোতের উপরিভাগে বসিয়া লহরী-

লীলা অবলোকন করিতেন, মনেং প্রীতি পাইতেন এবং সেই ভয়ার্ত্ত ব্যক্তিগণকে প্রবোধ দিতেন। এইরূপে প্রায় ছয় মাসকাল সমুদ্র পথে গমন করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

এই স্থানে আসিয়া অনেক বড়২ লোকের সহিত আলাপ হইল, যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পাইলেন। ইংরেজেরা বুদ্ধি, বিদ্যা ও ক্ষমতা বলে আপনাদিগের দেশকে যেরূপ রমণীয় করিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি লণ্ডন, লিবারপুল, মাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রধানং নগর সকল উত্তমরূপে ভ্রমণ করিলেন। সেখানকার অদ্ভুতশিল্পযন্ত্র, সুন্দর অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, রমণীয় উদ্যান, পরম শোভাকর অত্যুন্নত কীর্ত্তি স্তম্ভ, পথিক পূর্ণপান্থশালা, অনাথ নিবাস, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ভজনালয়, রাজসভা প্রভৃতি দেখিয়া পরম প্রীতি পাইলেন। ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী, ধর্ম্মচর্চ্চা এবং আচার ব্যবহারের

বিষয় অবগত হইয়া বিস্ময় সহকৃত আনন্দরসে অভিষিক্ত হইলেন।

এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কোম্পানি ইজারার মেয়াদ বাড়াইয়া, লইবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করেন। কোম্পানি কিরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন তাহা ইংলণ্ডেশ্বরকে জানাইবার জন্য এখানকার সমস্ত রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সেই সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের সাক্ষ্যও গৃহীত হয়। তিনি বিদ্বান্, রাজনীতিজ্ঞ ও ভারতবর্ষে ইংরাজ কোম্পানীর শাসন প্রণালীর বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্য অপেক্ষাকৃত আদরণীয় ও কার্য্যকারী হইয়াছিল। ইহা তাঁহার সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

ইংরাজদিগের শাসন প্রণালীতে যে সকল দোষ ছিল, নির্ভয়-চিত্তে প্রকাশ করিলেন এবং কি উপায়ে সেই সকল দোষের সংশোধন হইতে পারে উত্তমরূপে তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

১২৩৯ সালে তিনি ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স দেশ দেখিতে গেলেন। তখন লইস্ ফিলিপ্ সেখানকার রাজা ছিলেন, তিনি রাজা রামমোহন রায়কে যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং কয়েক দিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ফ্রান্স দেশে গমন করিবার পূর্ব্বে ফরাসী ভাষা উত্তমরূপ জানিতেন না; সুতরাং ফ্রান্সের রাজনীতি বুঝিতে এবং তত্রত্য প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইয়াছিল। এই জন্য ফ্রান্সে যে এক বৎসর মাত্র ছিলেন তন্মধ্যেই, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক উক্ত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়াই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জনপদের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, কেবল তাঁহাকে দেখা অবশিষ্ট ছিল; সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যেখানে২ গমন করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রেই পরম সমাদরে পরিগৃহীত হন। এক বৎসর পরেই ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন।

ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হওয়ার পর, ১২৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে তিনি ব্রিষ্টলের নিকটবর্ত্তী ষ্টেপেলটন্ গ্রোভ নামক স্থানে গমন করেন। তাঁহার কলিকাতাস্থিত বন্ধু হিন্দুকালেজের স্থাপয়িতা ডেবিড্ হেয়ারের কন্যা কুমারী হেয়ার তাঁহাকে ঐ স্থানে লইয়া যান। রাজা রামমোহন রায় কয়েক জন অনুরাগী মিত্রের সহিত তাঁহার ভবনে কিছু দিন পরম সুখে অতিবাহিত করিয়া উক্ত মাসের ২৫ এ পীড়িত হয়েন। ক্রমাগত ৯ দিবস পীড়া ভোগ করিয়া ২৭ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ২টা ২৫ মিনিটের সময় কলেবর ত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাদেশ অনুসারে মৃত্যুরপ্রায় ২০ দিবস পরে ষ্টেপেলটন্ গ্রোভের এক রমণীয় স্থানে তাঁহার শব স্বতন্ত্র-ভাবে সমাহিত হয়। তাঁহার বিদেশে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্বদেশীয় মিত্রগণের মধ্যে অনেকে ক্ষুভিত আছেন, কিন্তু যাঁহারা কুমারী কার পেণ্টারের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁ-

হারা জানেন ক্ষোভের বিষয় কিছুই নাই। ইংলণ্ড সদৃশ স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পীড়িত হইলে তাঁহাদের চিকিৎসাদি যেরূপ হওয়া সম্ভব, রাজা রামমোহন রায়ের তদপেক্ষা কম হয় নাই।

কলিকাতা নিবাসী গুণগ্রাহী দ্বারকানাথ ঠাকুর ১২৫০ সালে ইংলণ্ডে গমন করিয়া মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধি দর্শন করেন। তিনি দেখিলেন ষ্টেপেলটন্‌গ্রোভ স্থিত সমাধি কোন ক্রমেই তাঁহার মহামহিম নামের যোগ্য নহে, তাঁহার স্মরণের জন্য সেই সমাধির উপর কিছুই নাই। অতএব তিনি উক্ত বর্ষের ২৯এ মে রামমোহন রায়ের শব ঐ স্থান হইতে উত্তোলিত করিয়া অ্যারনোজভেল্‌ নামক স্থানে সমাহিত করেন এবং ঐ সমাধির উপর এক পরম সুন্দর স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উহা অদ্যাপি সৌন্দর্য্যের সহিত বর্ত্তমান আছে, ভারতবর্ষের অনেকে উহা দেখিয়া আসিয়াছেন।

তিনি যে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন,

তাহা এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পর, তিনি কোন্‌ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই বিষয়ে নানা জাতিতে নানা গোল তুলিয়াছিল। তাঁহাকে মুসলমানেরা মুসলমান, খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টান্‌ এবং বৈদান্তিকেরা বৈদান্তিক কহিত। কিন্তু তিনি এতিনের কোন মতাবলম্বী ছিলেন না। তবে কোরাণ, বাইবল, বেদ, বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে যথার্থ তত্ত্ব বিষয়ক বাক্য দেখিতেন তাহা অতি আদরপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মত অতি পবিত্র ও মহৎ ছিল; সবিস্তার লিখিতে গেলে বালকগণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া নিম্নে কয়েকটা স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।

তিনি বলিতেন মানুষেরা কখন ভ্রমশূন্য হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রও ভ্রম রহিত নয়। পরমেশ্বরের কত শক্তি, কত দয়া, কত ক্ষমতা, কেমন আকার, কি অভিপ্রায়, তাহা সম্যক্‌ রূপে বর্ণিত হওয়া দূরে থাকুক কল্পিত হইতেও পারে না।

সংসার ও আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া বনবাস আশ্রয় করা ধর্ম্ম নয়, পার্থিব বস্তুদ্বারা পুরাণ কল্পিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা ধর্ম্ম নয়, দর্শন শাস্ত্র পড়িয়া পরমেশ্বর নিরূপণ করিতেছি বলিয়া তর্ক বিতর্ক করা ধর্ম্ম নয়, ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বরের অনুগৃহীত বলিয়া পূজা ও বিশ্বাস করা ধর্ম্ম নয়, জল বায়ু অগ্নি সূর্য্যকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা ধর্ম্ম নয়, ছাপা গায় দিয়া করতালী চীৎকার ও মৃদঙ্গাদির বাদ্যোদ্যমে নিশার নিস্তব্ধতা নষ্ট করা ধর্ম্ম নয়। যে আদি পুরুষ সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, মঙ্গলময়, স্বতন্ত্র, নিরাকার, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব নিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান, ধ্রুব ও পূর্ণ পুরুষের উপাসনা দ্বারাই লোকের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁহাতে প্রীতিস্থাপন ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। ইহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। ইহার অনুষ্ঠান

ও প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিয়াগিয়াছেন। তাঁহার এই যত্ন অনেক অংশে সফল হইয়াছে।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই, যে, মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় যেরূপ মনুষ্য, আমি সাধারণের সমক্ষে তাঁহার তদনুরূপ পরিচয় দিতে পারিলাম না। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র-চরিত এতাদৃশ সংক্ষেপে বর্ণন করায় তাঁহার প্রতি যে, অত্যন্ত অন্যায় করা হইল তাহার সংশয় নাই। আমি এই অন্যায়ানুষ্ঠান নিবন্ধন পাঠকগণ সমীপে বিলক্ষণ অপরাধী হইলাম; এবং যত দিন তাঁহার অমানুষ চরিত বিস্তৃত রূপে স্বতন্ত্র পুস্তকে নিপিবদ্ধ করিতে না পারিব ততদিন ঐ অপরাধের মার্জ্জনা হইবে না। যাহা হউক, বড় দুঃখের বিষয় এই যে, যিনি আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক এতাদৃশী মহতী উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছেন; আমরা আমাদের সেই স্বদেশীয় মহা পুরুষকে চিনিতে পারি নাই এবং তাঁহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দেই

নাই। তিনি স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে অধিক সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় লোকেরা তাঁহার গুণের যথার্থ গৌরব করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সময়ে সহস্র২ ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়াছেন। ভক্তিমান খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের খ্রীষ্টের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে; রামমোহন রায়ের প্রতি ইউরোপীয় অনেক লোকের সেই রূপ ভাব ছিল। যখন তাঁহার মনে কুচিন্তার উদয় হয় তখনই তিনি উপাসনা করেন, এই কথা শুনিয়া একটী স্ত্রীলোক বিস্মিত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আপনার মনেও কি কুচিন্তার উদয় হয়?।" একথা অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন রায় স্থান বিশেষের বড় লোক নহে তিনি পৃথিবীর বড় লোক ছিলেন। তিনি রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয়েরই পারদর্শী ছিলেন। বিবিধ ভাষায় ও বিবিধ বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী

ভাষায় অধিকার দেখিয়া ইউরোপীয়েরা বিস্মিত হইতেন। পারসী ভাষা এত শিখিয়া ছিলেন যে, মৌলবী রামমোহন রায় বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। সংস্কৃত ভাষায় এমন পুস্তকই ছিল না তিনি যাহার সমালোচন করেন নাই। স্বদেশীয় দর্শন ও মনোবিজ্ঞান ভিন্ন২ ভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার্থি-বিদেশীয়দিগের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ রামমোহন রায়ের ন্যায় মনুষ্য পৃথিবীতে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন।

—•০•—

পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়।

—●●●—

আমি এখন সংক্ষেপে যাঁহার জীবন চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি এক জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। যদিও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না, তথাপি যে সকল গুণ থাকিলে মানুষের চরিত আদর্শ স্বরূপে সাধারণকে উপহার দেওয়া যায়, তাঁহার সেই সকল গুণের প্রায় একটীরও অপ্রতুল ছিল না। এই প্রস্তাবের শিরোদেশে তাঁহারই নাম লিখিত হইয়াছে।

তিনি, ১১৮৫ সালে হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী বালী গ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গোকুল চন্দ্র এক জন কুলীন ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কতিকাতায় চাকরী করিয়া মাসে তিন চারি শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং পরিবার

পোষণের ক্লেশ ছিল না। পদ্মলোচন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

তিনি, পাঁচ বৎসর বয়সের সময় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যান। কিছু দিন পরে, পিতা তাঁহাকে জান বাজারের "ফ্রীস্কুল" নামক ইংরাজী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দেন। "বহুবাজারের পাকড়াশীরা তাঁহার মাতামহ বংশ।" তিনি মামার বাড়ী থাকিয়া উত্তম রূপে ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন।

তিনি, যে স্কুলে পড়িতেন সে স্কুলের ছাত্র প্রায় সমুদায়ই ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীর সন্তান। তাহাদের অধিকাংশ পদ্মলোচনের সদ্গুণে বাধ্য হইল। তাঁহার সহিত প্রণয় হওয়াতে তাহারা আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতে লাগিল। পদ্মলোচনও তাহাদের ও অন্যান্য সাহেবদের সহবাসেই অবকাশ কাল কাটাইতেন। সর্ব্বদা ইংরাজের সহিত কথাবার্ত্তা কহাতে তিনি সুন্দর রূপে ইংরাজী কহিতে শিখিলেন। ইহা অল্প আশ্চর্য্যের

বিষয় নহে যে, তিনি ইংরাজদিগের সাহস, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, দেশ-হিতৈষা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল অভ্যাস করিলেন; কিন্তু, এখনকার লোকেরা যেমন সাহেবের সঙ্গে মিলিলেই ধুতি ছাড়িয়া পেল্টুলান পরেন—স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং সুরাসক্ত হন, সেরূপ তাহাদের একটীও দোষ স্পর্শ করিলেন না।

যে সময়ে এদেশে লেখা পড়ার রীতিমত আলোচনা ছিল না, প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে এরূপ শিক্ষা স্থান কোন গ্রামেই ছিল না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোল ও গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ব্যতীত অন্য বিদ্যালয় ছিলনা; সে সময়ে কেহ সামান্য রূপ কিছু লেখা পড়া শিখিলে সকলে তাঁহাকে বিদ্বান্ বলিয়া আদর করিত। যে পদ্মবাবু সেই সময়ে ইংরাজী ভাষায় বাস্তবিক সুশিক্ষিত হয়েন তিনি যে, বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত এবং দেশীয় লোকের প্রচুর প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

অল্প দিনেই স্কুলের পড়া ছাড়িয়া কলিকাতার কোন সওদাগরের বাড়ী চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই উহা ছাড়িয়া দিয়া কোম্পানির কোন আফিসে কর্ম্ম করিতে গেলেন। বেভিনিউ আক্কাউণ্টিণ্ট (১) আফিসে প্রথমে ১৫ টাকা বেতনে এক কেরাণীর কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। সদ্গুণের পুরস্কার হইবেই হইবে। তিনি বিলক্ষণ নিপুণতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন, সকলের সহিত সরল ও উদার ব্যবহার করিতে লাগিলেন, প্রাণান্তেও মিথ্যা কহেন না, সাহেবেরা তাঁহার এই সকল গুণ দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং পর পর তাঁহাকে উচ্চপদ প্রদান করিতে লাগিলেন। শেষে পদ্মবাবু ঐ আফিসে ১০০ টাকা বেতনে রেজিষ্ট্রারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই

(১) যে আফিসে দেশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাবাদি থাকে।

বাঙ্গালী রেজিষ্ট্রারের পদটী কেবল পদ্ম লোচনের জন্যই সৃষ্ট হয়, ইহা পূর্ব্বে ছিল না।

আফিসে যতগুলি বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ছিলেন, কেহই পদ্মবাবুর মত শুদ্ধ করিয়া ইংরাজী কহিতে পারিতেন না। সুতরাং আফিসের সাহেবদিগের, কাহাকে কিছু বুঝাইতে হইলে বা কাহারও কোন কথা বুঝিতে হইলে পদ্মলোচন মাঝ খানে না থাকিলে চলিত না। সাহেবেরা অবসর কালে পদ্ম বাবুকে নিকটে ডাকিতেন এবং কথোপকথন করিয়া বড় প্রীত হইতেন। এইরূপে ক্রমে পদ্ম বাবু আফিসের বড়২ কর্ম্মচারী সাহেব এবং যাঁহারা কোন কর্ম্ম করিতেন না এরূপ অনেক প্রধান২ স্বাধীন সাহেবের আদরণীয় বন্ধু হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন যাহা অনুরোধ করিতেন, সাহেবেরা তখনি তাহা রক্ষা করিতেন। ক্রমে আফিস্ মধ্যে তিনি এক জন প্রধান হইয়া উঠিলেন, ইচ্ছানুরূপ অনেক কার্য্য করিতে পারিতেন।

তিনি বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াই মাতুলা-

লয় ত্যাগ করিয়া বালীর বাড়ী গমন করিলেন। প্রতি দিন নৌকা করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বালীর লোকের ঘোরতর দুরবস্থা। তাহাদের লেখা পড়া শিখিবার স্থান কি অর্থ উপার্জ্জনের উপায় কিছুই ছিলনা। তাহারা ভয়ানক দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইত এবং পরস্পর পশুবত্ ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদা অসুখী থাকিত। গ্রামবাসিগণের এই দুরবস্থা দেখিয়া দয়াময় পদ্মলোচনের অন্তঃকরণ কাঁদিয়া উঠিল। কিরূপে অবস্থা শুধরাইয়া তাহাদিগকে সুখী করিবেন নিরন্তর সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে অনেক ভাবিয়া বালীর স্তিৎসাই পাড়ায় একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না; আবার যাহারা নিতান্ত দুঃখী পুস্তকাদি কিনিতেও অক্ষম; পদ্মলোচন, নিজব্যয়ে তাহাদিগকে পুস্তকাদি প্রদান করিতেন। প্রথমে পদ্ম বাবু স্বয়ংই শিক্ষাদিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে কিছুক্ষণ শিক্ষা

দিয়া ১০টার পর কলিকাতায় যাইতেন; সেখানে সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়াই বিদ্যালয়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার এই সময়ের পরিশ্রম মনে করিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। পদ্মবাবু, ধন্য! তোমার সাধু ইচ্ছা।

এই রূপে কয়েক বত্সর গত হইলে পদ্ম বাবু একটু বিশ্রাম করিতে পাইলেন। তাঁহার প্রধান২ ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য্যের ভার লইল; তিনি কেবল রাত্রিতে তাহাদিগকেই শিখাইতে লাগিলেন। যেদিন আফিস বন্ধ থাকিত সেদিন সমুদায় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

ছাত্রেরা যেমন এক প্রকার লিখিতে ও পড়িতে সমর্থ হইতে লাগিল, পদ্ম বাবু অমনি তাহাদিগকে আফিসে লইয়াগিয়া কর্ম্ম করিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে সাহেবেরা তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া বেতন বাড়াইয়া দিতে চাহিলেন। পদ্মবাবু উত্তর করিলেন,—"আমার ১০০টাকা বেতন

যথেষ্ট হইয়াছে,—আর বৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই।" তিনি যে, একবার মাত্র ঐরূপ বলিয়াছিলেন তাহা নয়, যখন২ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব হইত তখনি ঐরূপ বলিতেন। তিনি যে, কেবল ঐ কথাটী মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন তাহাও নয়, উহার সঙ্গে২ আরও কিছু বলিতেন; তাহা এই, কখন কহিতেন, আমার হাতে এত কাজ পড়িয়াছে একা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি না; আমাকে যে টাকা দিতে চাহিতেছেন তাহাতে আমার ২।১ টী সহকারীর পদ বাড়াইয়া দিন, এবং দয়া করিয়া ঐ সকল পদে আমার ছাত্রগণকে নিযুক্ত করুন। যেহেতু তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই। কখন বলিতেন, এই আফিসে আমার ২।১ জন প্রতিবাসী কর্ম্ম করিতেছে, দেখিতে পাই উহারা যে বেতন পায় উহাতে তাহাদের পরিবারের দুঃখ ঘুচে না, অতএব আমাকে যে টাকা বাড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন তাহা উহাদিগকে দিন। তিনি নিজ

বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে বরাবর এইরূপ নিঃস্বার্থ ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

পদ্ম বাবু, গ্রামবাসী কোন ব্যক্তির দুঃখের কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। সাধ্যমত তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেন। কেহ তাঁহাকে দুঃখের কথা জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সবিশেষ পরিচয় লইতেন। সেই পরিবারে যে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারিত তাহাকে আফিসে লইয়া গিয়া কর্ম্মশিক্ষার্থিরূপে নিযুক্ত করিতেন। ইহার মধ্যে কোন২ ব্যক্তিকে নিজ ব্যয়ে আফিসে যাইবার পোসাক করিয়া দিতেন। যখন দেখিতেন তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়াছে তখন সঙ্গে করিয়া একজন প্রধান সাহেবের কাছে লইয়া যাইতেন এবং কহিতেন এই লোকটী বড় দুঃখী লেখা পড়া যাহা জানে কাজ চালাইতে পারিবে—অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার একটা উপায় করিয়া দিলে আমি যথেষ্ট উপকৃত হই। সাহেবেরা পদ্মবাবুর যেরূপ সম্মান

করিতেন তাহাতে উক্ত সদভিপ্রায় মূলক অনুরোধ সকল সফল হইতে ক্ষণকালও বিলম্ব হইত না। তিনি এই রূপে খালীর অনেকের অন্নসংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা পদ্মবাবুর সদ্গুণের আলোচনা করিতে২ মোহিত হইয়া উপযুক্ত স্থলে তাঁহার সাংসারিক বৃত্তান্ত বলিতে বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তাহাই বলিতে চলিলাম। বোধ হয়, যে সময়ে তিনি বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন, সেই সময়েই খালনা জয়পুরের পালধিদিগের বাটীতে তাঁহার বিবাহ হয়। পদ্মলোচন যেমন এক জন সদ্গুণশালী সাধু পুরুষ, সহধর্ম্মিণীও সর্ব্বাংশে তাঁহার অনুরূপ হইলেন। তাঁহার মন দয়া ও সরলতায় অলঙ্কৃত ছিল।

পদ্মলোচন দুঃখীর দুঃখ মোচনে যত অর্থ ব্যয় করিতেন, পরোপকারে যত সময় ক্ষেপণ করিতেন, তাঁহার সাধুশীলা প্রণয়িনী তাহাতে ততই সন্তুষ্ট হইতেন, কিছুমাত্র

বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। পদ্মবাবু এরূপ স্ত্রী পাইয়া যে, পরম সুখী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি সে কালের সম্ভ্রান্ত কুলীনের ছেলে হইয়াও একের অধিক বিবাহ করেন নাই, ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

তাঁহার পিতার দুই সংসার। পদ্মলোচন জ্যেষ্ঠার সন্তান। যাঁহার দুই বা অধিক স্ত্রী, প্রায় তিনি ছোটটীরই অধিক বাধ্য হন। গোকুল চন্দ্রও ঐ পথের পথিক হইয়াছিলেন। পদ্মবাবুর বিমাতা অত্যন্ত সপত্নী বিদ্বেষিণী, তিনি সতত সপত্নীর সহিত কলহ করিতেন। এবং নিরন্তর চেষ্টা দ্বারা তদীয় পুত্রকে পিতৃ-স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিলেন। পদ্মলোচন তাহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। তিনি বিমাতার প্রতি যত ভক্তি প্রকাশ করিতেন, "আপনি বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন না।" বলিয়া যত বুঝাইতেন, তিনি ততই তাঁহাকে শক্ত২ গালাগালি দিতেন। পিতার স্নেহশূন্য ব্যবহার এবং বিমাতার শত্রুতা, পদ্ম-

বাবু অনেক দিন অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন। শেষে দেখিলেন, বিমাতা কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না, দিন২ তাঁহার প্রতি অধিকতর-অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কি করেন, পাছে তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে হয়, পাছে রাগ করিয়া তাঁহার অবাধ্য হইতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি বালী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। এবং তথায় একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় বাস করিলেন বলিয়া বালী ভুলিয়া গেলেন না, মাঝে২ আসিয়া পিতা, বিমাতা, ও প্রতিবেশিগণের তত্ত্বাবধান করিয়া যাইতেন।

কালক্রমে পিতার শেষ দশা উপস্থিত হইল। এপর্য্যন্ত, তাঁহার যত অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল, মৃত্যুর ২।১ দিন পূর্ব্বে তিনি পদ্মলোচনের অগোচরে সমুদায়, ছোট স্ত্রী ও তাঁহার গর্ভজাত সন্তানগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। পিতা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন

করিয়াছেন শুনিয়া পদ্মলোচন নিকটে আইলেন। তীরস্থ করার পর তাঁহার পিতৃব্য কহিলেন, তোমার পিতার কিছু আছে, এই বেলা জিজ্ঞাসা করিয়া লও। পদ্মলোচন কহিলেন পিতার কিছু আছে কি না আর জিজ্ঞাসা করিব না। কারণ আমি জানি তিনি আমার অপেক্ষা আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে অধিক ভাল বাসেন; যদি কিছু থাকা সত্য হয় তাহাদিগকেই দিয়া আসিয়াছেন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কহিতে পারেন। আমি অন্তিমকালে তাঁহাকে মিথ্যা বলাইতে অভিলাষ করি না। তবে উহাঁর ঋণ আছে কি না জিজ্ঞাসা করা উচিত। পরে পদ্মলোচন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সহজেই অনেক ঋণের হিসাব দিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে পদ্মলোচন কর্জ্জ করিয়া শ্রাদ্ধ শান্তি ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সূত্রে তাঁহাকে কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিতে হইল, তথাপি বিমাতা কি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা

দিগের নিকট এক পয়সাও সাহায্য চাহিলেন না। কলিকাতার বাটী বিক্রীত হওয়াতে অগত্যা তাঁহাকে পুনর্ব্বার বালীর বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে হইল।

শেষ দশায় পদ্মলোচনের যে সকল সাংসারিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল শুনিলে সকলেই দুঃখিত হইবেন। কিন্তু ধৈর্য্যশালী পদ্মলোচন সেই সকল দুঃখ অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার চারিটী পুত্র সন্তান হয়, তার মধ্যে তিনটী সুশিক্ষিত হইয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছিলেন এবং কনিষ্ঠটী হিন্দু-কালেজে পড়িতেছিলেন। ক্রমে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিনটী পুত্রই অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন। এই প্রাণসম পুত্রগণের বিয়োগে পদ্মলোচন শোকান্ধ হন নাই। মধ্যম পুত্র গুরুদাস বাবুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে পদ্মলোচন প্রকৃতিস্থ চিত্তে একজন বিদেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। কি আশ্চর্য্য! আবার পরদিন প্রভাতেই শোকতাপ বিস্মৃত হইয়া একটী

অনাথ বালককে কলিকাতার দাতব্য সমাজে লইয়া গেলেন।

পদ্মবাবু দুইটী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। স্কুল স্থাপন করিয়া বালকগণকে লেখা পড়া শিখাইতেন বলিয়া বাঙ্গালীর লোকেরা তাঁহাকে "স্কুলমাষ্টার" বলিয়া আদর করিত। এখন যেমন ও উপাধিকে লোকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সে সময়ে 'স্কুলমাষ্টার' উপাধি অল্প প্রশংসার ছিল না। এবং সাহেবেরা তাঁহার সত্যবাদিতা ও স্বার্থশূন্য পরোপকারিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'লার্ড পদ্ম' এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। স্যারা, উইঞ্চ, গ্ল্যাস্ প্রভৃতি বড়২ সিবিলিয়ান সাহেবেরা তাঁহাকে 'লার্ডপদ্ম' বলিয়া সম্মান করিতেন। ইংলণ্ড সদৃশ সভ্যতম দেশের সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীস্থ লোকেরা লর্ড বলিয়া আখ্যাত হয়েন। উক্ত উপাধি ইংলণ্ডে কিরূপ লোকেরা প্রাপ্ত হন তাহা, ইহা বলিলেই কতক বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান শাসন কর্ত্তা সরজন লরেন্স অদ্যাপি লার্ড উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। পাঠক এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রাগুক্ত সাহেবেরা লার্ড বলিয়া পদ্মবাবুর কতদূর সম্মান বৃদ্ধি করিতেন।

পদ্মবাবু বলবতী দয়া ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। আবার ইংরাজী শিক্ষার গুণে ঐ দুই বৃত্তি আরও সতেজ ও মার্জ্জিত হইয়াছিল। পরের দুঃখ শুনিলেই তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া যাইত, যতক্ষণ সেই দুঃখের প্রতিবিধান করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ তাঁহার মনের স্থিরতা থাকিত না।

তিনি অত্যন্ত নিরীহ ছিলেন। অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিলেও কোন রূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। এক বার সাহেবেরা তাঁহাকে প্রধান পোষ্ট আফিসের দেওয়ানী দিতে চাহিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, ঐ শ্রেণীতে অনেক অভদ্র লোক কর্ম্ম করিয়া থাকে, যদি তাহাদিগের

মধ্যে কেহ কোন রূপ দুষ্কর্ম্ম করে, আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে; অতএব আমার ঐ কর্ম্ম স্বীকারে অভিলাষ নাই। পরে সাহেবেরা অনেক বুঝাইয়া, যাহাতে অধিক গোল মাল নাই, উক্ত পোষ্ট আফিসের সেই অধ্যক্ষতাপদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরে একটী লোক তাঁহাকে কোন কর্ম্মের প্রার্থনা জানাইল, তিনি তাহাকে সে কর্ম্ম দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেই নূতন ব্যক্তি টাকা চুরি করিয়া কাটকে গেল। তাঁহার চোকের উপর এক ব্যক্তি এইরূপ কুকর্ম্ম করিল এবং তাহার উপস্থিত দুঃখের প্রতিকার আপনার ক্ষমতাতিরিক্ত দেখিয়া আগ্রহের সহিত পদত্যাগ করিলেন।

তিনি যখন কলিকাতায় থাকিতেন তখন নীলমণি দে নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ইনি ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পদ্মবাবু তাঁহার সহিত ইংরাজী শিক্ষার উন্নতিসাধনে

ও ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উভয়ের মনের ভাব প্রায় সকল বিষয়ে এক রূপ ছিল, সুতরাং তাঁহাদের বন্ধুত্ব যে অত্যন্ত সুখজনক হইয়াছিল তাহা বলা অধিক।

পদ্মলোচন যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন সে বংশ শক্তির উপাসক। কিন্তু শক্তি উপাসনার প্রতি তাঁহার বাস্তবিক বিদ্বেষ ছিল। তিনি শাক্তগণের উপাসনা-প্রণালী দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা যখন দুর্গোৎসব কি শ্যামাপূজা উপলক্ষ্যে বান্ধবগণের সহিত মহাড়ম্বরে বলিদান করিয়া আমোদ করিতেন, তিনি তখন নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কোন প্রতিবেশীর গৃহে অবস্থান করিতেন। বলিদানের কোলাহল কর্ণগোচর হইলে তিনি রোদনোন্মুখ হইতেন। কিন্তু এই সকল জঘন্যাচার-রহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গোড়াগুড়ি শ্রদ্ধা ছিল। এক্ষণে নীলমণি বাবুর সহিত আলাপ হওয়াতে সহজেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

পদ্মলোচন অত্যন্ত সত্য-প্রিয় ছিলেন। জীবিত-কালের মধ্যে কখন জ্ঞান পূর্ব্বক মিথ্যা কহেন নাই। কাহাকে মিথ্যা কহিতে দেখিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন। বালী নিবাসী কোন ব্যক্তির দুঃখের কথা শুনিবামাত্র পদ্ম বাবু তাহার গৃহে গমন করিতেন এবং নানা প্রকার উপায় দ্বারা সেই দুঃখের প্রতিকার করিতেন। প্রতিবেশী কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে ঔষধ পথ্য দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাকে কেহ কখন কোন বিপুর বশ হইতে দেখে নাই। তিনি আপন মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সামান্য ভাবে কালযাপন করিতেন। যার পর নাই, বিনীত ছিলেন। যদি কোন উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহার নিকট সেই উপকারের কথা উপস্থিত করিত তিনি "রাম! রাম!" বলিয়া কাণে হাত দিতেন। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া যে

অবকাশ থাকিত তাহা, তুলসীর মালা হস্তে অভীষ্ট দেবের স্মরণে ও কয়েকটী সাধু শিষ্যের সহিত আলাপ-সুখে অতিবাহিত করিতেন।

তিনি শরীর রক্ষা বিষয়েও অমনোযোগী ছিলেন না। প্রতি দিন অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করিতেন। পরে কিছু কাল ব্যায়াম করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি মৎস্য মাংস আহার করিতেন না। অপরাহ্ণে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া বায়ু সেবন করিতেন। এই সকল কারণে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সবল শরীর ছিলেন। শরীর-শ্রী এরূপ উত্তম ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই মহা পুরুষ বলিয়া বোধ হইত।

তিনি বরাবর স্বোপার্জ্জিত অর্থে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কখন কোন বিষয়ে কাহারও সাহায্য লয়েন নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি শেষে পেন্সন লইয়া তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। গমন

কালে তৃতীয় পুত্রের নিকট যে ১০০৲ টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, পেন্সনের টাকা পাইবা-মাত্র তাহা বৃন্দাবন হইতে পাঠাইয়া দেন !!

কিছু কাল ভ্রমণ করিয়াই গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। পরে ১২৪৭ সালে দ্বিষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলেবর ত্যাগ করি-লেন। মৃত্যুকালে কিছুই সংস্থান ছিল না। পদ্ম বাবুর মৃত্যুতে বালী তখন যে, অনাথ হইয়াছিল তাহা বলাই অধিক।

যে বালী এক্ষণে এ দেশ মধ্যে একটী গণনীয় গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে, এখন যাহার এমন পাড়াই নাই যাহাতে ২।৪ জন সুশি-ক্ষিত দেখিতে না পাওয়া যায়, যাহার শত২ লোক এখন নিঃস্বার্থে পরের হিতকর কার্য্যে মন দিতেছেন, শুভকরী সভা ও শুভকরী পত্রিকা যেখানে আপনাদের নাম স্বার্থক করিয়া বহুদিন বিরাজিত ছিলেন ; পদ্মলো-চন বাবুই যে, সেই বালীর এতাদৃশী উন্নতির নিদান একথা কে নয় বলিবে ?

পদ্ম বাবুর জীবন-তরুর মূল অবধি

অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলে মন জাগিয়া উঠে, ভয় ও বিস্ময়ের সহিত এই রূপ ভাবের উদয় হয় যে, মানুষ কিরূপ পদার্থ এবং তাঁহাদিগকে কি ভাবে চলিতে হইবে তাহা দেখাইবার জন্যই যেন পদ্ম বাবু পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন !!

বালকগণ, যদি মানুষ হইতে চাও—বড় হইতে চাও—দেশবিদেশে বিখ্যাত হইতে চাও—মনুষ্য ও ঈশ্বরের প্রিয় হইতে চাও—যদি সুখী হইতে চাও ; তবে মহাত্মা পদ্ম-লোচন মুখোপাধ্যায়ের জীবন-পথে গমন কর।

—•০•—

মতিলাল শীল।

—●●●—

পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে মানুষের কতদূর উন্নতি হইতে পারে, মতিলাল শীলের জীবন চরিত পাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

প্রায় সত্তর বৎসর হইল, চৈতন্যচরণ শীল নামে একজন স্বর্ণবণিক কলিকাতার কলুটোলায় বাস করিতেন। তিনি মধ্য-বিত্ত ও বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ও দুইটী কন্যাসন্তান জন্মে। এই পুত্রের নাম মতিলাল, ১১৯৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার প্রায় পাঁচবৎসর বয়সের সময় চৈতন্যচরণ পরলোক গমন করেন।

মতিশীল, লেখাপড়া শিখিবার জন্য প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গিয়াছিলেন। সেখানে যতদূর হইতে পারে, কিছুদিনের মধ্যে সে সমুদায় শিক্ষা করিলেন। বাঙ্গালা লেখায় এমন হাত পাকিল এবং শুভঙ্করের

অঙ্ক প্রণালী এমন উত্তম রূপে শিখিলেন যে, তাঁহার অক্ষর ও অঙ্ককসা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইত ও তাঁহার বুদ্ধির কত প্রশংসা করিত। তিনি লেখা পড়া শিখিবার উপযুক্ত সুযোগ পান নাই; কিন্তু যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিই তাহার প্রধান কারণ।

১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, কলিকাতার মধ্যে সুরতির বাগান নিবাসী মোহনচাঁদ দের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার কিছু দিন পরে আনুমানিক ১২১৯ সালে শ্বশুরের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম দেশীয় তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন, জয়পুর, প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করা হইল। সুতরাং এই তীর্থ দর্শনানুরোধে তাঁহার বিষয়ি-জনোচিত দিগ্‌দর্শন ঘটিয়া গেল। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ১২২২ সালে বিষয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতার দক্ষিণে যেগড় আছে অর্থাৎ যেখানে ইংরাজ রাজাদিগের নানা প্রকার

জিনিস পত্র ও সৈন্য থাকে, মতিশীল প্রথমে সেই স্থানে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। এই কর্ম্ম করিতে করিতেই ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়।

১২২৬ সালে বোতল ও ককের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ছোলা কিনিয়া কৃষ্ণপাণ্ডী যেমন অসঙ্গত লাভ করেন, ঐ ব্যবসায়ে মতিশীলেরও প্রায় সেই রূপ হইয়াছিল। অতি অল্প মূল্যে রাশীকৃত বোতল ও কক্ কিনিয়া তাহা বিলক্ষণ চড়া দামে বেচিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই লাভই তাঁহার উন্নতি ও উৎসাহের মূল।

ইংলণ্ড হইতে কোম্পানির যে সকল বাণিজ্য জাহাজ কলিকাতায় আসিত, মতিশীল কিছু দিন পরে কেল্লার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহার কাপ্তেন সাহেবদিগের মুচ্ছুদ্দি হন। জাহাজে যে সকল দ্রব্য আসিত তাহা বেচিয়া দিতেন এবং আমাদের দেশীয় বিবিধ দ্রব্য তাঁহাদিগকে কিনিয়া দিতেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ সম্মান ছিল ও যথেষ্ট

লাভ হইত। ক্রমাগত নয় বৎসর এই কার্য্য করেন।

১২৩৫ সালে তিনটী হৌস্ অর্থাৎ ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ হইলেন। স্মিথ্সন্ হোগুস্ ওষার্থ, লিভিংষ্টোন্ এবং লিচ্ কেটেল ওয়েল্ এই তিন সাহেব উক্ত তিন কুঠীর অধিকারী ছিলেন। ক্রমশঃ অনেক বড়২ বণিক সাহেবের কুঠীর অধ্যক্ষ হইলেন। এখন তিনি পরিশ্রম জনক এত অধিক কার্য্যে আসক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা এমন সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতেন যে, মানুষে সেরূপ পারে না। কুঠী সমুদায়ের প্রাত্যহিক উপস্থিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও নিত্যং আয় ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার করিতেন। প্রতি দিন ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেন,—"নিত্য পরিষ্কার করিবার কারণ এই যে, কাহার নিকট কত দেনা এবং কাহার কত পাওনা তাহা নিত্যই জানিতে পারি এবং যদি কেহ প্রাপ্য টাকা চায় তৎক্ষণাৎ দিতে পারি।"

এই সময়ে তিনি কেবল কুঠীর কার্য্য করিতেন এমন নহে—নিজের বাণিজ্যও বিলক্ষণ বাড়াইয়াছিলেন। বোতল ও কক্ ছাড়া দেশীয় ও ইউরোপীয় ভূরি প্রমাণ বিবিধ দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

ক্রমে মতিশীল বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। যখন কুঠী আণ্ডলা সাহেবদের কারবার বন্ধ হইয়া যায়, সেই সময়ে স্মিথসন্ সাহেবের কলিকাতাস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী ময়দার কল ক্রয় করেন। এই কল অতি অদ্ভুত পদার্থ, বাষ্পের বলে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। যে বাড়ীতে এই যন্ত্র স্থাপিত, কেবল গম আনিয়া সেই বাটীর এক স্থানে রাখিয়া দিলেই কিছু কাল পরে রাশীকৃত প্রস্তুত ময়দা পাওয়া যায়, আর কিছুই করিতে হয় না। এই কল অদ্যাপি কলিকাতায় আছে, এখন একজন সাহেব ভাড়া লইয়া উহার কার্য্য চালাইতেছেন।

ধনাগমের সঙ্গে২ তাঁহার টাকা উপার্জ্জনের ইচ্ছা বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু তাহা

বলিয়া তিনি কখন টাকার জন্য অসৎ পথে গমন করেন নাই এবং দুরাকাঙ্ক্ষও ছিলেন না। যখন তাঁহার ঘরে চারিদিক্ হইতে অজস্র অর্থ আসিতেছিল সেই সময়েই তিনি ভাড়াটিয়া বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অনেক ভূমি ও গৃহ ক্রয় করিলেন। এই রূপ দেখিয়া যাঁহারা তাঁহাকে অর্থগৃধ্নু মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে আমি এই বলি যে, লোকের ভাল করিব বলিয়া উচ্চপদ গ্রহণ বা বিপুল অর্থোপার্জ্জন কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে। লোকের ভাল করিবার ইচ্ছা তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনে নিয়োজিত করিয়াছিল কি না যদিও আমি তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার অর্থে জগতের অনেক উপকার হইয়াছিল, এই জন্যই আমি এরূপ ইচ্ছা করি না যে, লোকে তাঁহাকে অর্থগৃধ্নু বলেন। সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে তিনি ধনের, প্রকৃত প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

যে সময়ে গবর্ণর জেনেরল মার্কস আব্ হেষ্টিংস বাহাদুর, এদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বহু সংখ্যক বিদ্যালয় ও সমাজ সংস্থাপিত করেন এবং বঙ্গ দেশীয় অনেক বড়২ লোককে তাঁহার সহায়তা করিতে উৎসাহিত করেন, দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইবার ও দেশের যথার্থ মঙ্গল করিবার অভিলাষ মতিশীলের মনে সেই সময়েই উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা তাদৃশ উন্নত ও অভীষ্ট পূরক ছিলনা। এক্ষণে সময় পাইয়া ১২৪৯ সালে কলিকাতার অন্তর্গত পটলডাঙ্গায় একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। "শীল্‌স্ কালেজ্" ইহার নাম হইল। প্রথমে ছাত্রগণের নিকট একটাকা করিয়া বেতন (১)লইতেন; কিন্তু কাগজ, কলম,

*(১) সে সময়ে লোকের এই রূপ সংস্কার ছিল এবং অদ্যাপি অনেকের আছে যে, বিনা বেতনে বালক পড়ান অপমান জনক। এই নিমিত্ত প্রথমং বেতন লওয়া হইত।

পুস্তক প্রভৃতি যাহা কিছু পাঠার্থিগণের প্রয়োজনীয় তাহা সমুদায়ই নিজে দিতেন। পরে ঐ বিদ্যালয় "হিন্দু মেট্রাপলিটান" নামক বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়া গেল। কিছু দিন পরে মেট্রাপলিটান কালেজ উঠিয়া গেলে উহা পুনরায় পৃথক হইল। এই সময়েই মতিশীল বালকগণের নিকট হইতে বেতন লওয়া এবং তাহাদিগকে কাগজ কলম দেওয়া রহিত করিয়া দিয়া "সল্‌স ফ্রীকলেজ" (১) নাম দিলেন ঐ বিদ্যালয় অদ্যাপি এই অবস্থায় বহুবাজারে স্থাপিত আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের অবস্থা এইরূপ ছিল,—৩৩০ জন ছাত্র পাটীভ্যাস করিত এবং অন্যূন পাঁচ শত টাকা উহার মাসিক ব্যয় ছিল। বোধ হয় বর্ত্তমান কালেও উহার অবস্থা ঐ রূপই আছে। ঐ বিদ্যালয় চিরস্থায়ী করিবার জন্য তিনি সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া গিয়াছেন।

(১) মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়।

১২৩৬ সালে যখন লার্ড বেণ্টিক বাহাদুর এই দেশের সতীদাহের ভয়ানক প্রথা রহিত করেন, সেই সময়ে এদেশীয় কতক গুলি ধর্ম্মান্ধ হিন্দু সহগমনের স্বপক্ষে ও বেণ্টিক বাহাদুরের বিপক্ষে কলুটোলায় একটী 'ধর্ম্ম-সভা' স্থাপন করেন। সভার সভ্য মহাশয়রা বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও ভারতবন্ধু বেণ্টিক মহোদয়ের শুভ সঙ্কল্প বিফল করিতে পারেন নাই। নিরন্তরই তাঁহাদের সভায় দলাদলি, জাতিমারা, প্রভৃতি বিষয় লইয়া মহা গোলযোগ হইত। যে সময়ে মতিশীল পটল ডাঙ্গায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেই বৎসরের কোন সময়েই তিনি ধর্ম্ম-সভায় উপস্থিত হইয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই ;—"হে সভ্যগণ, আপনারা সর্ব্বদা যে সকল আলোচনা ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তদ্দ্বারা কোন প্রকার ধর্ম্ম সাধনই হইতেছে না,—বরং ইহাতে দেশের বিবিধ অনিষ্ট হইতেছে। অতএব আপনারা এরূপে

সময় নষ্ট না করিয়া এতাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন যাহাতে আপনাদের ধর্ম্ম-সভার নাম সার্থক হয়।" এই রূপ বলিয়া যাহাতে সভার ব্যয় হইতে দেশের অনাথ ও অক্ষমদিগের ভরণ পোষণ হয় সভ্যগণকে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিলেন। কেবল তাঁহার যত্ন ও বিশিষ্ট সাহায্যে ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। যাহাদিগের খাওয়াইবার লোক নাই এবং যাহারা স্বয়ংও জীবিকা অর্জ্জনে অক্ষম, কলিকাতা নিবাসী এমন শত২ লোক মতিশীলের দয়া ও শ্রমের ফল ভোগ করিতে লাগিল। কালক্রমে অন্যান্য দাতারা দান বন্ধ করিলেন, ধর্ম্মসভা উঠিয়া গেল, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুশীল মতিশীলের করুণ-হস্ত পূর্ব্ববৎ প্রসারিতই রহিল। ১২৯৪ সালে এই ব্যাপার ঘটিলে আপনার বিষয় হইতে ঐ কার্য্যের এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, কলিকাতাবাসী অনেক নিরাশ্রয় দরিদ্র অদ্যাবধি তাহাতে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

তিনি যে সময়ে বিদ্যালয় করিয়াছিলেন, যে সময়ে ধর্ম্ম-সভায় সমাগত হইয়া অনাথ পালনের উপায় করিয়াছিলেন; সেই সময়েই আর একটী এমন কার্য্য করেন যে, সকলেই এক বাক্য হইয়া তাহাকে প্রধান সৎকার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।—কলিকাতার প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে এবং কলিকাতা হইতে যে রাজপথ বারাকপুরে গিয়াছে তাহার পূর্ব্ব ধারে 'বেল ঘরে' বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। অথবা, সম্প্রতি ঐ স্থানে ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়ের একটী ষ্টেসন্ হওয়াতে উহার আর পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। সদাশয় মতিশীল ঐ স্থানে একটী অতিথি শালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যেখানে অদ্যাবধি প্রতি দিন ন্যূনাধিকচারি শত (কখন২ ৭।৮ শত অতিথিও এককালে সমাগত হয়!) বিদেশীয়-বুভুক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ইচ্ছানুরূপ পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হয় এবং তাঁহার গৌরবান্বিত নাম মনে করিয়া পুলকিত

হয়। আহা! অজ্ঞাত দেশে আগত—রবিতাপে উত্তাপিত—ঘর্ম্মাক্ত কলেবর—ক্ষুৎপিপাসাকাতর—নিঃস্বম্বল—পরিশ্রান্ত পথিকের বিষণ্ণ বদনে যাহার কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, সেই মহাত্মার জীবন ও অর্থোপার্জ্জন সার্থক!

মতিশীল, এইরূপ সৎ বিষয়ের অনুষ্ঠান ও আলোচনায় জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার অনেক গুলি অসাধারণ গুণ ছিল। কোন্ কর্ম্ম কিরূপে করিলে কিরূপ ফল হইবে, তিনি পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন না। বুঝিবার দোষে কোন বিষয়ে কষ্ট পাইলে আর সে দিকে যাইতেন না। একটী পয়সা অপব্যয় করিতেন না। কিন্তু বিলক্ষণ সদ্ব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার নিত্য খরচের বাহুল্য হইলেও তাহাতে সামঞ্জস্য ছিল। কোন কারণ বশতঃ যদি কাহার প্রতি একবার দ্বেষ হইত, জন্মা-

বহিন্নে আর তাহার সহিত কথা কহিতেন না। যত ইচ্ছা, বড় বা সম্পর্ক-বিরুদ্ধ লোক হউন কেন, স্পষ্ট কথা বলিতে কাহাকেও ছাড়িতেন না। যত ইচ্ছা, জটিল বিষয় হউক না কেন, আপনার বুদ্ধির দ্বারাই তাহার এক রূপ মীমাংসা করিতে পারিতেন। বিষয় বুঝিবার শক্তি এমন উত্তম ছিল যে, বড়২ সাহেবেরাও তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন। আচার-ভ্রষ্ট স্বধর্ম্ম-ত্যাগী কিম্বা গোঁড়া হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া আশ্রয় লইলে প্রাণপণে তাহার রক্ষা করিতেন। দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া কাতর হইতেন, পরোপকারে বিমুখ হইতেন না। যাহা বলিতেন তাহার অন্যথা করিতেন না।

তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গৌরচন্দ্র শীল ধন-

বান্ লোক ছিলেন। পুত্র না থাকায় মৃত্যু-কালে আপনার এক কন্যাকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান সেই কন্যা অক্ষম ছিলেন বলিয়া মতিশীলের উপরি বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমাবস্থায় ঐ বিষয় হইতে মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে, ঐ টাকা কেন, উহা অপেক্ষা অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া সময়ে ঐ টাকা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া পরিশোধ করিয়াছিলেন। তিনি এই পরিবারের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনো বাক্যে চেষ্টা করিতেন। বালকগণ, এই আখ্যান, তাঁহার মনের কিরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে দেখ! দেখি?

তিনি, যে স্মিথ্ সন্ হোগুস্ ওয়ার্থ সাহেবের কাছে কর্ম্ম করিয়া উন্নত হইয়াছিলেন, তদীয় মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী দুঃখে পড়িয়া

অনেক দিন এই দেশে ছিলেন। মতিশীল, তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম—অনেক যত্ন ও অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এমন কি! বিবি স্বদেশ ইংলণ্ডে গমন করিলে তিনি সেখানেও টাকা পাঠাইয়া দিতেন। দিতেন কেন?

স্মৃতি ও তর্কশক্তি বিলক্ষণ বলবতী ছিল। স্মৃতির কথা কি কহিব, রীতিমত শিখেন নাই, কিন্তু, সর্ব্বদা ইংরাজদিগের সঙ্গে থাকিতেন বলিয়াই, দেখিয়া শুনিয়া কার্য্যোপযোগী ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। প্রায় সকল বিষয়ই বুঝিয়া তর্ক করিতে পারিতেন।

তাঁহার বাবুগিরি ছিল না; স্বভাব পূর্ব্বাপর একই রকম ছিল। ধুতি চাপকান হাতে বাঁধা পাগড়ী ইহাই তাঁহার চিরজীবনের কুঠীর পরিচ্ছদ ছিল। জমীদার হইব অনেকের প্রভু হইব বলিয়া এই যে একটা অভিলাষ, মানুষের টাকা কড়ি হইলে প্রায়ই হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার তাহা ছিল

না। কেবল ঋণ দানই তাঁহার ভূম্যধিকারের মূল কারণ। অর্থাৎ যাহাদিগকে ধার দিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে নগদ টাকা দিতে অসমর্থ হইয়া তালুক দিয়াছিল। সন্তানগণের যত্নে ঐ জমীদারী এক্ষণে দিন২ বৃদ্ধি পাইতেছে।

যাহাহউক, যিনি এত গুণের লোক ছিলেন, যিনি কেবল আপনার বুদ্ধি পরিশ্রম ও যত্ন দ্বারাই উন্নতি তরুর উচ্চতম শাখার ফলভোগ করিয়াছিলেন, যিনি নানা প্রকার সৎকর্ম্ম দ্বারা জগতের উপকার ও আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াগিয়াছেন, যিনি অনাথের নাথ বিপন্নের শরণ ও বণিক বংশের আভরণ স্বরূপ ছিলেন; ১২৬১ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ রজনীযোগে আপনার প্রস্তুত গঙ্গার বাঁধা ঘাটে সেই মহা পুরুষ মতিশীল ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে জীবন কার্য্য শেষ করেন। তিনি নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব মধ্যমাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য ছিলেন। শুনা গিয়াছে ২। ৩ দিনের রোগে অতি সাহসের সহিত প্রাণত্যাগ করেন।

এক্ষণে তাঁহার পুত্রেরা মহা সমারোহে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের সমৃদ্ধির সীমা নাই। তাঁহার পাঁচ পুত্র। আমি বড় আহ্লাদের সহিত লিখিয়া গেলাম যে, পাঁচ জনই বর্ত্তমান, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হীরালাল, মধ্যমের নাম চুণিলাল, তৃতীয় পান্নালাল, চতুর্থ গোবিন্দ লাল, এবং কনিষ্ঠের নাম কাণাই লাল। কন্যাও পাঁচটী, তাঁহারা সকলেই সৎপাত্রে প্রদত্তা হইয়াছেন। মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে লোকে "ধনেপুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও" বলিয়া থাকে, মতিশীলই প্রকৃত রূপে সেই আশীর্ব্বাদের ফলভাজন হইয়াছিলেন।

আমরা এখন প্রার্থনা করি আমাদের দেশে এতাদৃশ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। যাঁহাদের ধন ও ক্ষমতা দ্বারা এক্ষণে দেশের মঙ্গল না হইয়া বরং অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাঁহারা মতিলাল শীলের অনুকরণ করুন।

—●●●—

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

—●●●—

ইনি, ১২৩১ সালে কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুরে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন প্রধান কুলীন ছিলেন। তাঁহার সাত বিবাহ। এই সাত পত্নীর মধ্যে হরিশের মাতা সর্ব্ব কনিষ্ঠা। হরিশের জননী, ভবানীপুর বাসী কোন সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্রাহ্মণের দৌহিত্রী; ইনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। কুলীনেরা বিবাহিতা স্ত্রীগণকে প্রায় গৃহে লইয়া যান না, স্ত্রীরা আপনাপন সন্তানাদি লইয়া পিত্রালয়েই বাস করেন। তদনুসারে হরিশের মা, মামার বাড়ী থাকিতেন। পরে তাঁহার ঐ স্থানে থাকিয়াই বিবাহ হয়; সুতরাং মার মামার বাড়ীতে হরিশের জন্ম হইয়াছিল।

হরিশ, যদিও পৈত্রিক বিষয় পান নাই; তথাপি বাল্যকালে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ছিল

না। ভাগ্যবান্ মাতুল তাঁহাকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহে ও যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন।

তিনি অতি শৈশব কালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাড়ীতে ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করেন। পরে সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভবানীপুরেই কোন ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ, অতি অল্প দিনের মধ্যে, হরিশকে এক জন বুদ্ধিমান ও মেধাবী শিক্ষার্থী বলিয়া জানিতে পারিলেন। তিনি প্রাত্যহিক পাঠ সকল এমন তন্ন২ করিয়া বুঝিতেন এবং এত সূক্ষ্ম২ পশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতেন যে, বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক সেই জন্য সতত শঙ্কিত থাকিতেন। হরিশ অতিশয় শ্রম ও মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন।

৬।৭ বৎসর পড়া হইলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে, হিন্দু কালেজের

ছাত্রগণের সহিত কোন বিশেষ পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি যে পরীক্ষা দিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, ঐ অরীক্ষা নিমিত্ত যতদিন পড়া হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সময় আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিতে মোহিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রকৃত বিষয় নিরূপণ করিতে না পারিয়া ঐ অনুরোধ করেন।

এই পরীক্ষার পর তিনি স্কুলের পড়া ছাড়িয়া কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। জীবিত কালের মধ্যে আর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। কিছু দিন পরে নিলাম কারক কোন বণিক সম্প্রদায়ের আফিসে ১০ টাকা বেতনে এক কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। মেঃ টলা নামক এক সাহেব ঐ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। হরিশ-বাবু প্রত্যহ নব২ উৎসাহের সহিত ভবানীপুর হইতে টলার আফিসে কর্ম্ম করিতে যাইতেন। যেরূপে, ছাতা হাতে—পান চিবাইতে২—লম্বা২ পা

ফেলিয়া নির্ভয় চিত্তে গমন করিতেন এবং ঐ সামান্য কর্ম্মে যেরূপ শ্রম ও যত্ন করিতেন তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রথমাবস্থার মিত্রগণ বুঝিয়াছিলেন তিনি ভবিষ্যতে এক জন বড় লোক হইবেন।

এই স্থানে তিনি অনেক দিন কাজ করিয়াছিলেন। পরে ১২৫৮ সালে কোন সৈনিক কার্য্যালয়ে ২৫ টাকা বেতনের এ-কটী পদ শূন্য হইল। ঘোষণা দ্বারা সম্বাদ পাইয়া হরিশ উহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ কর্ম্মে ক্রমশঃ উন্নতির সম্ভাবনা ছিল বলিয়া উহা পাইবার জন্য অনেকেই অভিলাষী হইয়াছিলেন। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগকে একটী পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। সেই পরীক্ষায় হরিশ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেন দেখিয়া অধ্যক্ষগণ তাঁহাকেই কর্ম্মে নিয়োজিত করিলেন।

হরিশের বুদ্ধি দেখিয়া ও স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট গুণগ্রামে বাধ্য হইয়া মেঃ কেলনার, মেঃ মেকেঞ্জি, প্রভৃতি অধ্যক্ষ ও প্রধান

কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে মিত্র জ্ঞান করিতেন। তিনি বিদ্যা শিক্ষায় ও অধ্যয়নে একান্ত অনুরাগী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে সদুপদেশ ও পাঠ্য পুস্তক দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি আরও অধিক পুস্তক পাইবার আশয়ে আপনার সেই অল্প বেতন হইতে ২ টাকা বাঁচাইয়া কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়ের স্বাক্ষরকারী হইলেন। অর্থাৎ সেই পুস্তকালয়ে মাসে২ কিছু২ দিয়া ইচ্ছামত পুস্তক দেখিতে পাইতেন। কুটীর অবকাশ কালে হরিশ, মেটকাক্ হলে উপবিষ্ট হইয়া প্রধান২ পণ্ডিতগণের গ্রন্থ সকল প্রগাঢ় মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে, দৃষ্ট হইতেন।

তিনি কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা কর্ম্মস্থলের সমস্ত অধ্যক্ষগণের নিকট অবিলম্বে সবিশেষ পরিচিত হইলেন। কর্ণেল্ গল্ডি ও চ্যাম্পনিজ্ সাহেবের প্রিয়পাত্র হইলেন। ঐ কর্ণেলদ্বয় সুযোগ পাইলেই হরিশকে উচ্চ পদে উন্নত

করিতেন। এমন কি তাঁহার নিযুক্ত হওয়ার বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে বেতন ১০০ টাকা হইয়াছিল। ক্রমশঃ তিনি সহকারী মিলিটারি আডিটরের সম্মানসূচক ও ভারবহ পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মধ্যে অনেক গোলযোগ যায়। হরিশ স্বভাবতঃ স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন। অধ্যক্ষগণের অন্যায় প্রভুত্ব সহিতে পারিতেন না। এক দিন কোন হিসাবে একটী ভুল দেখিয়া কর্ণেল চ্যাম্পনিজ্ তাঁহাকে তিরস্কার করেন। হরিশ নিশ্চয় জানিতেন সেটী তাঁহার ভুল নহে। কিন্তু চ্যাম্পনিজ্ তাঁহাকে দোষী করিয়া অবিশ্বাস করিতেছিলেন। ইহাতে, প্রভুর অবিশ্বাস স্থলে চাকরী করা উচিত নহে, বিবেচনা করিয়া তিনি একেবারে কর্ম্মত্যাগের বাসনা প্রকাশ করিলেন। কর্ণেল্ গল্‌ডি দেখিা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে উহার অনুসন্ধান করিয়া আনন্দের সহিত জানিতে পারিলেন, হরিশের দোষ নাই। তখন আবার, অতিরিক্ত তেজস্বিতা

প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া হরিশ, চ্যাম্পনিজ্ সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; তিনিও লজ্জার সহিত ক্ষমা করিলেন। তাঁহারা হরিশকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, এই আকস্মিক সামান্য ঘটনায় তাহার কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। সাহেবেরা যতদিন এখানে ছিলেন; তাঁহার প্রতি সমান স্নেহ ও প্রণয় প্রকাশ করিতেন।

কুলীনের ছেলে বলিয়া ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। উত্তর পাড়ার গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার একটী কন্যা হয়; ঐ কন্যাটী ৬ দিবসমাত্র জীবিত ছিল। পর বৎসরেই আর একটী পুত্র জন্মে। এই শিশুটী ১৫ দিবস বয়সে মাতৃহীন হইয়া পিতামহীর স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছিল; কিন্তু তিন বৎসর না হইতেই প্রাণত্যাগ করিয়া বাল্য বিবাহের বিষময় ফল দেখাইয়া যায়! পত্নী বিয়োগের চারিমাস পরে মাতার অনুরোধে হরিশ পুনরায় বিবাহ করেন।

তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার বাসনা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। সেনা সম্বন্ধীয় কার্য্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াই নানা প্রকারে অধ্যয়নের সুবিধা করিলেন। তিনি এই সময়ে ইংরাজী ভাষায় বেশ লিখিতে ও প্রস্তাব রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে যত সংবাদ পত্র প্রকাশ হইত, প্রায় সকল কাগজেই হরিশের লেখা দেখা যাইত। কিন্তু তিনি এরূপ লেখায় তৃপ্ত না হইয়া আপনি কোন সম্বাদ পত্রের সম্পাদক হইতে বাসনা করিলেন।

তদনুসারে "হিন্দু ইণ্টালিজেন্সর" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকারী ও সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের সহিত আলাপ করিলেন এবং কিছুদিনের পরেই উহার একজন প্রধান লেখক হইলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত মনের মিল না হওয়াতে এবং সম্পাদক তাঁহার লিখিত কয়েকটী প্রস্তাব পত্রিকাস্থ না করাতে তিনি ক্রমশঃ ঐ পত্রিকার উন্নতি

সাধনে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে কলিকাতার কোন ক্ষমতাপন্ন ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি "বেঙ্গল রিকর্ডার" নামক এক খানি পত্রিকা প্রচার করিতে লাগিলেন।

"ইণ্টালি জেন্সরের" সহিত সংস্রব রাখা তাঁহার বিরক্তিকর হইয়াছিল। সুতরাং এক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়া "রিকর্ডারের" সম্পাদক হইলেন। কিছু দিন পরে রিকর্ডার রহিত হইয়া "হিন্দুপেট্রিয়ট্" নামক সম্বাদ পত্রের সৃষ্টি হইল। রিকর্ডারের গ্রাহকগণই ইহার গ্রাহক হইলেন এবং ইহার কর্ম্মচারিগণ ও হরিশ এই নূতন পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন। লাভাঙ্কে পেট্রিয়ট্কে অকিঞ্চিৎকর দেখিয়া অধ্যক্ষ চিন্তিত হইলেন এবং তিন বৎসরের মধ্যে কয়েক সহস্র টাকা লোক্সান দিয়া ইহার স্বত্ব বিক্রয়ের বাসনা প্রকাশ করিলেন। কোন ক্রেতা উপস্থিত না হওয়াতে পত্রিকা প্রচার রহিত করিয়া মুদ্রাযন্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ বিক্রয় করা স্থির করিলেন।

হরিশ, মিতব্যয়িতা গুণে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। 'পেট্‌রিয়ট্' প্রচারে লাভ হইতেছে না এবং আপনি উহার অবস্থা উন্নত করিতে পারিবেন কিনা তাহার ঠিক্ নাই, এরূপ দেখিয়া শুনিয়াও উক্ত সঞ্চিত অর্থ দ্বারা উহার স্বত্ব ক্রয় করিলেন। যে-হেতু, পেট্‌রিয়ট্‌টী এককালে রহিত হইয়া যায় ইহা কোন রূপেই তাঁহার সহ্য হইল না। আর ইহাও স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রমে পেট্‌রিয়ট, অন্ততঃ আপন ব্যয়োপযোগী অর্থও উপার্জ্জন করিবে। সম্বাদ পত্র লিখিয়া নিজে এক পয়সাও লাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন না।

১২৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে তাঁহার ভ্রাতার নামে কাগজ চালাইতে লাগিলেন। ছাপাখানা ও কার্য্যালয় ভবানীপুরে বাটীর নিকটে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। ১২৬৪ সালের আষাঢ় মাসে ১০০ এবং অপর কয়েক মাসে কিছু২ লোকসান দিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষতি তিনি এরূপে

সহ্য করিয়্যছিলেন যে, তন্নিমিত্ত কেহ কখন তাঁহাকে বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখে নাই। বরং লোকে মনে করিত উহার দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ৬৪ সাল হইতে "প্রেট্‌রিয়ট্" দ্বারা বাস্তবিক লাভের সূত্রপাত হয়। হরিশ, আপন বিদ্যা বুদ্ধি ও শ্রম দ্বারা শেষে ইহাকে এক বিপুল লাভ দায়ক ও দেশ-মান্য পত্রিকা করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার প্রভু চ্যাম্পনিজ্ সাহেব রাজনীতির আলোচনা ও প্রয়োজনীয় তাড়িত বার্ত্তা সকল প্রকাশের সুবিধা করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। হরিশও এ সকল বিষয়ে তাঁহার ন্যায় অতিশয় অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন দেখিয়া যে কোন তাড়িত বার্ত্তা তাঁহার হস্তগত হইত তাহা প্রতিদিন সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিতেন; তিনি তাহা যত্ন পূর্ব্বক পেট্‌রিয়টে প্রকাশ করিতেন। ১২৬৩ সালে হরিশ অতিশয় শ্রম সহকারে সাবধান হইয়া কাগজ চালাই

তে লাগিলেন। এই সময়ে সিপাইরা ইংরাজদিগের বিদ্রোহী হইয়াছিল। সিপাইদিগকে বিদ্রোহী হইতে দেখিয়া সাহেবেরা মনে করিয়াছিলেন, কি বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানীয় ভারতবর্ষ বাসী প্রায় সমুদায় লোকই রাজ বিদ্রোহী হইয়াছে। কেবল হরিশের লেখনীই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে এ ভ্রম দূর এবং বাঙ্গালীরা নিতান্ত নিরীহ ও রাজ-ভক্ত হইয়া প্রতিপন্ন করে। এই সকল কারণে অতিশীঘ্রই পেট্‌রিয়ট্ সকলের আদরণীয় হইয়া উঠিল।

বিদ্রোহ-শান্তি হইলে সেনানায়ক চ্যাম্পনিজ্ সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশ গমন করিলেন। হ্যালিংটন্ নামক অপর এক ব্যক্তি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। চ্যাম্পনিজ্ যখন প্রস্থান করেন তখন হরিশ প্রভৃতি প্রধান২ কর্ম্মচারিদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া কহিলেন,—"হাজার টাকা মাহি আনার ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা যেরূপ কাজ পাওয়া

যায়, আমার এই সকল দেশীয় কর্ম্মচারী ২।৩ শত টাকা বেতনে সেই রূপ কর্ম্ম করিতেছে। আমি এবং কর্ণেল গোল্ডিঙ বরাবর ইহাদিগের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছি, প্রার্থনা করি আপনিও সেই রূপ রাখিবেন।" অনন্তর হরিশের উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইতে লাগিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হ্যালিংটন্, পূর্ব্বোক্ত সাহেবদের ন্যায় হরিশের প্রতি শিক্ষক কি বন্ধুর ভাব প্রকাশ না করিয়া অধিক প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেন; কিন্তু মৌখিক স্নেহ প্রকাশেও ত্রুটি হইত না। হ্যালিংটনের চিত্তের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি হরিশকে দুইবার পদচ্যুত ও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হরিশ স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন, কর্ণেল হ্যালিংটনের লঘু-চিত্ততায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ইচ্ছা পুর্ব্বক আরও একবার কর্ম্মত্যাগের প্রস্তাব করিতে হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই কর্ণেল গোল্ডিঙ ও চ্যাম্পনিজ্‌কে স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

হরিশ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভবানীপুরের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনিও, সেই স্থানে মনোমত মিত্রগণের সহিত আলাপ ও লেখা পড়ার আলোচনা করিয়া বড় প্রীতি পাইতেন বলিয়া আপনাকে ভবানীপুরের নিকট ঋণী মনে করিতেন। বিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত হরিশ বন্ধুগণকে লইয়া ভবানীপুরে একটী সভা করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সভায় উপস্থিত হইয়া কঠিন২ শাস্ত্র সকলের আলোচনা করিতেন।

হরিশ একজন বড় লোক, ক্রমে২ প্রায় সকলেই তাহার পরিচয় পাইলেন। কয়েকটী বন্ধুও তাঁহার সঙ্গে২ উন্নত হইয়া প্রধান২ সম্ভ্রম জনক রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন অধিক বিখ্যাত। ইনি কিছু দিন অতি সম্মানের সহিত সদর আদালতে ওকালতী করিয়া শেষে সর্ব্ব প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি হইয়াছেন। ইহার নাম শম্ভুনাথ পণ্ডিত। তাঁহার আর একটী বিনয়ী মিতভাষী মিত্রও ঐ স্থানের

কোন উচ্চাসনে বসিয়া ব্যবস্থা ও রাজনীতির আলোচনা করিতেন।

ক্রমে হরিশের নানা বিষয়িণী শিক্ষা হইয়াছিল। তিনি অতিশয় মনোযোগ ও আনন্দের সহিত ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। গণিত শাস্ত্রেও বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপীয় বড় বড় বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ সকলের সমালোচন করিয়া পেট্রিয়টে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। তিনি ফাণ্ট্ ও হ্যামিল্টনের রচিত মনোবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া অনেক উত্তমোত্তম বিষয় লিখিয়াছিলেন। ফলে তিনি যেরূপ শিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে এক জন প্রধান বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

তিনি, ভারতবর্ষের ইংরাজদিগের ক্ষমতার আদিবৃত্তান্ত ও ক্রম-বিস্তৃত শাসন প্রণালী জানিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী

হরিশ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভবানীপুরের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনিও, সেই স্থানে মনোমত মিত্রগণের সহিত আলাপ ও লেখা পড়ার আলোচনা করিয়া বড় প্রীতি পাইতেন বলিয়া আপনাকে ভবানীপুরের নিকট ঋণী মনে করিতেন। বিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত হরিশ বন্ধুগণকে লইয়া ভবানীপুরে একটী সভা করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সভায় উপস্থিত হইয়া কঠিন২ শাস্ত্র সকলের আলোচনা করিতেন।

হরিশ একজন বড় লোক, ক্রমে২ প্রায় সকলেই তাহার পরিচয় পাইলেন। কয়েকটী বন্ধুও তাঁহার সঙ্গে২ উন্নত হইয়া প্রধান২ সম্ভ্রম জনক রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন অধিক বিখ্যাত। ইনি কিছু দিন অতি সম্মানের সহিত সদর আদালতে ওকালতী করিয়া শেষে সর্ব্ব প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি হইয়াছেন। ইহার নাম শম্ভুনাথ পণ্ডিত। তাঁহার আর একটী বিনয়ী মিতভাষী মিত্রও ঐ স্থানের

কোন উচ্চাসনে বসিয়া ব্যবস্থা ও রাজনীতির আলোচনা করিতেন।

ক্রমে হরিশের নানা বিষয়িণী শিক্ষা হইয়াছিল। তিনি অতিশয় মনোযোগ ও আনন্দের সহিত ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। গণিত শাস্ত্রেও বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপীয় বড় বড় বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ সকলের সমালোচন করিয়া পেট্রিয়টে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। তিনি ফাণ্ট্ ও হ্যামিল্টনের রচিত মনোবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া অনেক উত্তমোত্তম বিষয় লিখিয়াছিলেন। ফলে তিনি যেরূপ শিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে এক জন প্রধান বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

তিনি, ভারতবর্ষের ইংরাজদিগের ক্ষমতার আদিবৃত্তান্ত ও ক্রম-বিস্তৃত শাসন প্রণালী জানিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী

হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মহাসভার (১) জমা খরচের হিসাব হরিশের মুখ থাকিত। তিনি ইংলণ্ডের প্রাকৃত সমাজের (১) নির্দ্দিষ্ট পঞ্চম সম্বাদ মুখে২ কহিতে পারিতেন। মহাসভার পুরাতন পোকায় কাটা কাগজ পত্র সকল অতি মনোযোগ ও সহিষ্ণুতার সহিত পাঠ করিয়া ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকারের ইতিহাস নিঃসংশয়ে জা-

(১) ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে 'পার্লিয়ামেণ্ট' নামক একটী প্রধান সভা আছে। মহারাণীকে এই সভার সহিত মিলিয়া রাজ্য শাসনাদি সমুদায় কার্য্য করিতে হয়। এই সভা দুই ভাগে বিভক্ত, সম্ভ্রান্ত সমাজ ও প্রাকৃত সমাজ। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ও আয়র্লণ্ডের ৪৩৭ জন সম্ভ্রান্ত প্রথম ভাগের সভ্য। এই সভ্যগণের ৪৭ জন প্রধান২ ভূস্বামী এবং ৩০ জন বড়২ যাজক। সামান্য প্রজাগণের প্রতিনিধি ইংলণ্ডের ৫০০, আয়র্লণ্ডের ১০৫ এবং স্কটলণ্ডের ৫৩, সমুদায়ে ৬৫৮ ব্যক্তি দ্বিতীয় বিভাগের (প্রাকৃত সমাজের) সভ্য। ইঁহাদিগেরই ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক। এই মহাসভা যে, কেমন কাণ্ড বিশেষ রূপে জানিলে বিস্মিত হইতে হয়।

নিতে পারিয়াছিলেন। এই রূপ অনবরত অনুসন্ধান দ্বারা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে তিনি এত অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়!

তাঁহার মৃত্যুর ২। ১ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। নীলকরেরা প্রজাগণের প্রতি নানা প্রকারে অত্যাচার (১) করাতে প্রজারা "নীল করিব না" বলিয়া খেপিয়া উঠে। এই সময়ে হরিশ বাবু আপন পেট্রিয়ট্ পত্রিকায় ঐ অত্যাচার সকল প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের গোচর করিতে লাগিলেন। নীলকর ও প্রজা উভয়ের মধ্যে কাহারা দোষী জানিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্থানে২ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলেন।

(১) 'নীলপর্পণ' নামক বিখ্যাত নাটকে ইহার বিশেষ পরিচয় আছে।

এই সূত্রে এদেশের অনেক বড় বড় লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। হরিশ ১২৬৭ সালে ঐ সাক্ষ্য দেন। অনেক অনুসন্ধানের পর প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার সপ্রমাণ হইল। ঐ প্রমাণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হরিশের দ্বারা অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। হরিশ পূর্ব্বাবধি প্রজাগণের প্রতি যে অত্যাচার নিবারণ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, ১২৬৮ সালে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার উপায় হয়।

এখন দেখাযাউক হরিশ বাবুর চরিত্র লিখিয়া উঠিতে পারা যায়, কিনা। বুঝিতে না পারিলে পড়ায় লাভ নাই। তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে লিখিতে গেলে বালকেরা বুঝিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত স্থূলাংশ মাত্র লিখিত হইল। ইহাতে তাঁহার প্রতি যে অন্যায় করা হইল, আমি তজ্জন্য সাহৃদয় পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

তিনি প্রতিভা সম্পন্ন মনুষ্য ছিলেন।

তাঁহার বুদ্ধি স্বভাবতঃই তেজস্বিনী ছিল। আমরা প্রায় সকল বিষয়ই স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া যাই, কিন্তু তিনি সেরূপ দেখিতেন না; যে সে বিষয় ইউক না কেন, সকলেরই তন্ন২ করিয়া আন্দোলন করিতেন। তিনি সকল বিষয়ই সম্যক্ অনুভব করিতে পারিতেন, তাঁহার বুদ্ধি অনুভবে ক্লিষ্ট হইত না। স্মৃতিশক্তিও বিলক্ষণ ছিল—যাহা একবার চিত্তকোষে সংগ্রহ করিতেন তাহা প্রায় কখনই হারাইতেন না। কোন বিষয়ের কিয়দংশ মাত্র দেখিলে বা শুনিলেই তাহার সবিশেষ ভাব বুঝিতে পারিতেন। রাজনীতি সম্বন্ধীয় নূতন ভাব অবগত হইবার জন্য নিরন্তর উৎসুক থাকিতেন। মনের সাহস ও বল অপ্রমেয় ছিল, দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয়দিগের সাহায্য নিমিত্ত বলবান ও ক্ষমতাশালিদিগকে শত্রু করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া বহুসংখ্যক সম্বাদ পত্রিকা পাঠ করিতেন এবং তাহার মধ্যে মনোযোগের যোগ্য যে সকল বিষয় থাকিত তাহার টীকা

করিতেন। অথচ সেই সময়ে যে সকল বন্ধু ও অর্থী উপস্থিত থাকিতেন তাঁহাদিগের সঙ্গেও কথা বার্ত্তা কহিতেন। দশটা বাজিবা মাত্র সত্বর আহার গ্রহণ করিয়া আফিসে যাইতেন। ৫টা, বা কোন২ দিন তদপেক্ষা অধিককাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া সে স্থান হইতে বহির্গত হইতেন। আফিস্ হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর সাধারণ পুস্তকালয়ে গমন করিতেন, সেখানে যদি কোন নূতন পুস্তক বা পত্রিকা উপস্থিত থাকিত শীঘ্র তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় সভায় (১)

(১) কলিকাতা নগরে এদেশীয় প্রধান২ লোকদিগের একটী সভা আছে। সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করাই এই সভার উদ্দেশ্য। ভারতের অনিষ্ট নিরাকরণ ও হিতসাধন নিমিত্ত, অত্রত্য গবর্ণমেণ্টে কি ইংলণ্ডীয় মহাসভায় যদি কিছু জানাইবার আবশ্যকতা হয় এইসভাই জানাইয়া থাকেন। ফলতঃ সর্ব্বোপায়ে ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন করাই এই সভার প্রধান কার্য্য। ইহা 'ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' বলিয়া বিখ্যাত। হরিশ বাবু এই সভার কার্য্যকারী বিভাগের এক জন সভ্য ছিলেন। তিনিই এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা।

গমন করিতেন। সেখানে যে রাশীকৃত লেখা পড়ার কাজ থাকিত তাহা সারিয়া রাত্রি ১০। ১১ টার সময় বাড়ী আসিতেন। অতঃপর বন্ধুগণকে লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশেষ রূপে আমোদ করিতেন। এছাড়া কাগজ ছাপিবার দিন সমস্ত রাত্রি জাগিতেন। যে পেট্রিয়ট্ পত্র তাঁহাকে এত গৌরবান্বিত করিয়াছিল, সপ্তাহের মধ্যে তিনি ছ দিন তাহাতে হাত দিতে পাইতেন না। পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত পরিশ্রমের পর ছাপিবার রাত্রিতেই লিখিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভপূর্ণ করিতেন।

স্বাবলম্বনই তাঁহার প্রধান গুণ। তিনি কোন বিষয়েই কাহার সাহায্য লইতেন না—আপনিই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। রাজনীতি ও ব্যবস্থাবিষয়ে তিনি এত অধিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, বড়২ সদর আমীন ও মনসেপগণ তাঁহার বাড়ী গিয়া আইন ঘটিত জটিল বিষয় সকলের মীমাংসা করিয়া লইতেন। একবার দেশীয় লোকেরা কোন বিশেষ কার্য্য সাধনের

জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে মনোনীত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মাতার অনুরোধে যাইতে পারেন নাই।

তিনি মহৎ ও উত্তম লোক ছিলেন। পরোপকার সাধন তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তাঁহার জীবনকালে সাহায্যার্থি দিগকে কি করিতে হইত? আর কিছুই নয়, একবার ভবানীপুর গেলেই হইত, সেখানে হিত-ব্রত হরিশ পরোপকারে প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি যে, কেবল কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের উপকারী ছিলেন তাহা নয়, তিনি সাধারণের উপকারী ছিলেন। কোন সময়ে এক জন প্রধান লোক তাঁহাকে সদরের উকিল কিম্বা বা-নিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। হরিশ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় সময়ই ঐ কার্য্যে যাইবে, পরের কার্য্য করিতে অবকাশ পাইবেন না। কখন কোন ব্যক্তির, সাহায্য বা উপদেশ প্রার্থনা তাঁহার নিকট নিরর্থক হয় নাই। পরের

দুঃখ ঘুচাইবার যে কোন উপায় তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল তিনি তাহা অবাধে অবলম্বন করিতেন। তিনি যেমন উদার-চিত্ত, তেমনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন। কোন সময়ে এক জন সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদ্যপি কোন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীত্ব পাও, তথাপি নিজে যে রাজ্য (পেট্‌রিয়ট্‌) সৃষ্টি করিয়াছ তাহা ত্যাগ করিও না।" কিছু দিন পরে তাঁহার নিমিত্ত একটী উচ্চপদ উপস্থিত হইলে তিনি উক্ত সাহেবকে বলিয়াছিলেন "তুমিই জয়ী"। অর্থাৎ পাছে পেট্‌রিয়টে মনোযোগ করিতে না পারেন এই জন্য ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পেট্‌রিয়টের অর্থ 'হিতসাধন' তিনি ঐ পত্রিকার নাম সার্থক করিয়াছিলেন।

পাঠকগণ, হরিশ বাবু কি ভাবে আপন গৃহে অবস্থিতি করিতেন, আমি তোমাদিগকে তাহার এক চিত্র প্রদান করিলাম। ঐ দেখ! অত্যাচার পীড়িত প্রজাগণকে বিচারালয়ে যাইবার জন্য দরখাস্ত লিখিয়া দিতেছেন,

আবশ্যক খরচের জন্য টাকা দিতেছেন, প্রবল লোকদিগের নিকট হইতে সাহায্য দেওয়াইবার উপায় করিতেছেন, এবং উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সদ্বিচার লাভে সমর্থ করিতেছেন। আবার ঐ দেখ! রোরুদ্যমান রাইয়তগণে তাঁহার বাড়ী কোলাহলময় করিয়াছে, তিনি অবাক্ হইয়া তাহাদের দুঃখ কাহিনী শুনিতেছেন, তাঁহার চক্ষুজল রাইয়তের রোদনে উত্তর দিতেছে, তাহাদিগকে আপনার বিপন্ন ভ্রাতৃগণ মনে করিয়া পরম যত্নে আহারাদি করাইতেছেন এবং তাহাদিগের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দানের সঙ্কল্প করিতেছেন। আবার এদিকে দেখ! নিরুপায় পরিচিত ব্যক্তিকে বাহিরে লইয়া গিয়া নিস্তব্ধভাবে অর্থ প্রদান করিতেছেন, আপনার শরীর দিয়া পল্লীর অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাণ করিতেছেন, বিপদাপন্ন প্রতিবেশীর বিপদুদ্ধার বিষয়ে স্বকীয় সমগ্র ক্ষমতা নিয়োজিত করিতেছেন, অত্যাচারীর দণ্ড নিমিত্ত বিপুল সাহসে নির্ভর করিয়া যথোপযুক্ত যত্ন করিতেছেন এবং পীড়িত বন্ধুর শয্যায় বসিয়া সমদুঃখ অনুভব করিতেছেন।

তিনি মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যে আত্মা ও মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। শেষে, যে অবস্থায় আফিসের কার্য্য করিতেন—অপরে সে অবস্থায় শয্যাগত থাকে। এই অতিশ্রমই তাঁহার মৃত্যুকে সত্বর আহ্বান করিয়াছিল। তিনি সেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াও কি জন্য অবকাশ লয়েন নাই, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তিনিই তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। তাহা এই, "আমি আমার উচ্চপদস্থ ইংরাজ প্রভুগণকে ইহা জানাইবার জন্য বিদায় লই নাই যে, বাঙ্গালীরাও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে।" নীলকর পীড়িত প্রজাগণের দুঃখ দূর করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া তিনি কত কষ্টই ভোগ করিয়াছেন। এক দিকে নীলকর সাহেবেরা শাসাইতেছেন, আর দিকে আদালত হরিশের বিপক্ষে

ডিক্রি দিতেছেন, অপর দিকে সম্বাদ পত্র সকল তাঁহার নিন্দা ও গ্লানি লইয়া দ্বারেং ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি অবিচলিত ও অশঙ্কিত চিত্তে নীল-প্রধান প্রদেশের অত্যাচার-মূলক সত্য-বিবরণ সকল সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে তিনি আপন ব্যয়ে স্থানেং সম্বাদ সংগ্রাহক পাঠাইয়াছিলেন!

তাঁহার অন্তঃকরণ হিতময়, নিরহঙ্কার, ও যথোচিত দ্বেষী ছিল। অন্যের মন্দ হইয়া আমার ভাল হউক, তিনি এরূপ প্রার্থনা করিতেন না; কিরূপে অন্যের ন্যায় বড় হইব তাহাই ভাবিতেন। কি বিদ্যা, কি ধন, কি ধর্ম্ম, তাঁহার কোন বিষয়েই আড়ম্বর ছিল না। লোকের প্রতি আশার অতীত সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বাস্তবিক যে প্রকার ছিলেন, ভাব ভঙ্গী দ্বারা কখন কাহাকে তাহার অন্যরূপ দেখান নাই। তিনি জন্মভূমিকে জননীর ন্যায় দেখিতেন। যথার্থ দেশহিতৈষী তিনিই ছিলেন। কে-

মন করিয়া লোকের ভাল করিতে হয়—তিনিই জানিতেন।

তিনি যে, কেবল রাজনীতি ও পরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন তাহা নয় ধর্ম্মের আলোচনাতেও তাঁহার আস্থাছিল। এতকাজের মধ্যেও ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য বক্তৃতা লিখিতেন এবং ঐ সভার উন্নতি নিমিত্ত বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

তিনি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও দুঃখীর হিত-চিন্তায় নিবৃত্ত ছিলেন না। যখন শুনিলেন ষ্টেট্ সেক্রেটারি সর্ চার্লস উড্ (১) রাইয়তের পক্ষে নীল মোকর্দ্দমার যথাযোগ্য মীমাংসা করিয়াছেন, তখন সেই মুমূর্ষু দশাতে আপনাকে সুখী বোধ করিয়াছিলেন। বোধ হয় যেন এই কথা শুনিবার জন্যই সে অবস্থায় কয়েক দিন জীবিত

(১) ভারত রাজ্যের তৎকালীন সর্ব্ব প্রধান অধ্যক্ষ, ইনি ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন।

ছিলেন। যখন শুনিলেন, তিনি গৌরবান্বিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন তখন আপনাকে চির শান্তিতে সমর্পণ করিলেন।

নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম-দোষে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই হরিশ বাবু পীড়িত হয়েন। ক্রমে সেই রোগ প্রবল ও বদ্ধমূল হওয়াতে এমন শয্যায় শয়ন করিলেন যাহা হইতে আর উঠিলেন না! আহা! যেদিন হরিশ বাবু চির-নিদ্রায় অভিভূত হয়েন যে দিন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসে বঙ্গভূমি পবিত্র হয়,—যে দিন তাঁহার বিরহ-রূপ, ভারতের দুষ্পরিহর ক্ষতি সংঘটিত হয়; ১২৬৮ সালের সেই শোকাবহ ১৩ই আষাঢ়ের উল্লেখ করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে!

বালকগণ, একবার দেখ! হরিশ বাবু কেমন লোক। তিনি এক জন সামান্য ব্রাহ্মণের ছেলে, শুদ্ধ আপনার শ্রম ও যত্নে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ৪০০ শত টাকা বেতন হইয়াছিল। যদি তাঁহার দেশহিতৈষিতা তত

বলবতী না হইত তাহা হইলে তিনি ধনে মানে আরও উন্নত হইতে পারিতেন। কেবল জ্ঞানার্জ্জন ও সাধারণের হিতসাধনের অবকাশ কম হইবে বলিয়াই তিনি অন্য ব্যবসায়ে যান নাই। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ-কর্ত্তা কি প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন না, তিনি মিলিটারি আফিসের এক জন কেরাণী মাত্র ছিলেন। কিন্তু এত কাজ করিয়া গিয়াছেন যাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণও করিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি আত্ম-বঞ্চনা, শিক্ষা, বিলাস-বিদ্বেষ, স্বাধীন-তেজস্বিতা, এবং কার্য্যাত্মক পরোপকার দ্বারা মনুষ্যের আ-আদর্শ হইয়াছিলেন। মানুষকে কি করিতে হইবে এবং কি ভাবে চলিতে হইবে এই বিষয়ে তিনি আমাদের মনে এমন এক উত্তেজনা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যাহা চিরকালে নষ্ট হইবে না। যাঁহারা লেখা পড়া জানেন তাঁহারাত জানিতেনই যে, হরিশবাবু এক জন প্রধান দেশ-হিতৈষী লোক এবং পৃথিবীতে যতদিন লেখা পড়ার আলো-

চনা থাকিবে তত দিন সকলেই জানিতে পারিবেন হরিশ বাবু এক জন প্রধান দেশোপকারী লোক ছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ উপকার চেষ্টা এত কার্য্য-কারী হয় যে, তাঁহার জীবনকালে শত২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পর্ণকুটীর বাসী নিরক্ষর কৃষকগণও জানিতে পারিয়াছিল যে, ভবানীপুরে তাহাদের এক জন বিপদ-বন্ধু আছেন চাষারা গান (২) বাঁধিয়া তাঁহার গুণ ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। আহা! হরিশবাবুর জীবন-পথের যে অংশ পৃথিবীর উপর দিয়া গিয়াছে তাহা কি মহৎ! তাহা কি মনোহর।

(২) কোন নীল-কুঠীতে হরিশ নামে একজন অত্যাচারী দেওয়ান ছিলেন, তাঁহাকে এবং উপরোক্ত হরিশকে লক্ষ্য করিয়া চাষারা এই-রূপ গান করিত;—

" ভাস্‌ছে মন, মনের হরিষে
আগে লুটে খেত এক হরিশে-এখন বাঁচালে এক হরিশে
বুনে২ নীল, কত্তো জমী খীল,
এখন হতেছে তায়-অড়ল-কলাই-সারিষে॥' ইত্যাদি।

LIFE

OF

BABU ISSAN CHANDRA DATTA.

COMPILED

BY

RAMLAL MUKHOPADHYAYA

CALCUTTA:

The New Sanskrit Press.

1871.

Printed by Harimohan Mookerjea
12 Fukeer Chand Mitter's Street Calcutta.

বাবু

ঈশানচন্দ্র দত্তের

জীবনবৃত্তান্ত।

শ্রীরামলাল মুখোপাধ্যায়

সংকলিত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১২৭৮।

TO BABU TARACKNATH GHOSE

Rai Bahadoor,

Deputy Collector attached to the

Survey Department,

Who for a long series of years was held to be one of the best friends of the deceased great man, whose life is herein described.

This book is dedicated as a token of the writer's respectful regard and esteem.

মুখবন্ধ।

এই ভারতক্ষেত্রে কত কত মহৎ লোকের প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু এ কি দুরপনেয় দুঃখের বিষয় নহে, যে, কোন বিখ্যাত লোকের জীবন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসু হইলে তদিচ্ছা চরিতার্থ করিবার কোন উপায়ই সুলভ হয় নাই!

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার অদ্ভুত লিপিচাতুরীর পরিচয় মাত্র প্রাপ্ত হইতেছি ইহা সত্য বটে, কিন্তু যদি তাঁহার জন্মের আমূলাগ্র বিবরণ ও কি উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি তাদৃশ বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন তাহা বিজ্ঞাত হইতাম তাহা হইলে, কত সন্তোষ লাভের কারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই। অনেক সংস্কৃত-সন্দর্ভে কোবিদগণের নাম মাত্র লিখিয়াই গ্রন্থকারেরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন্ রাজার রাজ্যকালে কোন্ দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্দ্ধারিত নাই। ইহা অবশ্য সম্ভব যে তন্মধ্যে বহু সংখ্যক লোক সদাচারী ও সদনুষ্ঠায়ী ছিলেন; যদি তত্তদ্ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত আমাদের সুলভ হইত তাহা হইলে ভিন্ন

দেশীয় লোকের আচার বিশেষের অনুকরণ করিয়া আমরা তত্তজ্জাতির অনুকরণ লিপ্সু বলিয়া নিন্দিত হইতাম না ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষানুগত সদাচার সমূহ রক্ষা করিতে পারিতাম ও তৎসহ বিজাতীয় ব্যবহার সকল উপমেয় উপমিত হইত। ফলে তাহা আর কোন্ উপায় আশ্রয় করিয়া হইবে? সুতরাং ভূতপূর্ব্ব মহানুভবগণের চরিতাবলী পাঠ করিয়া যাহা আমরা শিক্ষা করিতে পারিতাম তাহার অত্যন্তাভাব হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমাদের জ্ঞানগোচরে যে সকল সাধুচরিতেরা গতাসু হইতেছেন তাঁহাদের চরিতাবলীর বহুল প্রচার হওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে, আমি প্রথমেই সত্যব্রত বাবু ঈশানচন্দ্র দত্তের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; এতদ্দ্বারা যেমন সর্ব্বসাধারণের চরিত্র সংশোধনেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তেমনি বিদ্যার্থী বালকগণের পাঠ্যগ্রন্থ মধ্যে ইহা গৃহীত হইলে রচয়িতাগণ প্রোৎসাহিত হইয়া এতদ্রূপ গ্রন্থ প্রণয়নে সফল প্রযত্ন হইতে পারেন। আমার অভিলষিত এই কল্পনাটি সর্ব্বত্র অনুমোদিত হইলে উপকৃত হইব।

বহরমপুর
১৮৭১। ২৭ জানুয়ারি।

ঈশানচন্দ্র দত্তের

জীবনবৃত্তান্ত।

বাবু ঈশানচন্দ্র দত্ত অতি ভদ্র কায়স্থ কুলসম্ভব, তিনি কলিকাতার রামবাগান পল্লির বিখ্যাতনামা বাবু পীতাম্বর দত্তের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং তৎকুল শ্রেষ্ঠ নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পৌত্র। শেষোক্ত মহাশয় একদা বণিকপোত সমূহের* "মুচ্ছদ্দী পদে" নিযুক্ত হইয়া অসাধারণ ধন সঞ্চয় ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন, কিন্তু তিনি এতাদৃশ বদান্য ও দেবদেবী পূজাপ্রিয় ছিলেন যে, তদীয় উপার্জ্জিত প্রভূত অর্থ তন্নিমিত্তই নিঃশেষিত হইয়া যায়; এমন কি তিনি বর্ত্তমান থাকিতেই

* কাপ্তেন সাহেবের।

দেশীয় লোকের আচার বিশেষের অনুকরণ করিয়া আমরা তত্তজ্জাতির অনুকরণ লিপ্সু বলিয়া নিন্দিত হইতাম না ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষানুগত সদাচার সমূহ রক্ষা করিতে পারিতাম ও তৎসহ বিজাতীয় ব্যবহার সকল উপমেয় উপমিত হইত। ফলে তাহা আর কোন্ উপায় আশ্রয় করিয়া হইবে? সুতরাং ভূতপূর্ব্ব মহানুভবগণের চরিতাবলী পাঠ করিয়া যাহা আমরা শিক্ষা করিতে পারিতাম তাহার অত্যন্তাভাব হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমাদের জ্ঞানগোচরে যে সকল সাধুচরিতেরা গতাসু হইতেছেন তাঁহাদের চরিতাবলীর বহুল প্রচার হওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে, আমি প্রথমেই সত্যব্রত বাবু ঈশানচন্দ্র দত্তের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; এতদ্দ্বারা যেমন সর্ব্বসাধারণের চরিত্র সংশোধনেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তেমনি বিদ্যার্থী বালকগণের পাঠ্যগ্রন্থ মধ্যে ইহা গৃহীত হইলে রচয়িতাগণ প্রোৎসাহিত হইয়া এতদ্রূপ গ্রন্থ প্রণয়নে সফল প্রযত্ন হইতে পারেন। আমার অভিলষিত এই কল্পনাটি সর্ব্বত্র অনুমোদিত হইলে উপকৃত হইব।

বহরমপুর
১৮৭১। ২৭ জানুয়ারি।

ঈশানচন্দ্র দত্তের

জীবনবৃত্তান্ত।

বাবু ঈশানচন্দ্র দত্ত অতি ভদ্র কায়স্থ কুলসম্ভব, তিনি কলিকাতার রামবাগান পল্লির বিখ্যাতনামা বাবু পীতাম্বর দত্তের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং তৎকুল শ্রেষ্ঠ নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পৌত্র। শেষোক্ত মহাশয় একদা বণিকপোত সমূহের* "মুচ্ছুদ্দী পদে" নিযুক্ত হইয়া অসাধারণ ধন সঞ্চয় ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন, কিন্তু তিনি এতাদৃশ বদান্য ও দেবদেবী পূজাপ্রিয় ছিলেন যে, তদীয় উপার্জ্জিত প্রভূত অর্থ তন্নিমিত্তই নিঃশেষিত হইয়া যায়; এমন কি তিনি বর্ত্তমান থাকিতেই

* কাপ্তেন সাহেবের।

পারিবারিক ব্যয় ব্যসন ও তন্নিবন্ধন যাবতীয় অবশ্য কর্ত্তব্যের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠাত্মজ সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজন বিখ্যাত কলিকাতার প্রথম "নেটীব" জজ বাবু রসময় দত্তের প্রতি বিন্যস্ত হয়।

ঈশানচন্দ্র ১৮১৮ খৃঃ অব্দের ১লা মার্চ্চ দিবসে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার শৈশবকাল উৎক্রান্ত ও জ্ঞানের ঈষদুন্নতি হইবামাত্র, জ্যেষ্ঠতাত রসময় দত্ত কৃত সমস্ত পরিবার পালনের উপকার, সকৃতজ্ঞ চিত্তে সর্ব্বদাই স্বীকার ও তৎকাল হইতে পিতা মাতাকে দেবদেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষাতীত না হইতেই তিনি মাতৃহীন ও তাঁহার পিতা পুনরায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বিমাতা কখনই স্বপত্নীগর্ভজাত সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী হয়েন না, সুতরাং ঈশানচন্দ্রের প্রতিই বা তদীয় বিমাতা কেন স্নেহানুরতা হইবেন?

ফলতঃ তিনি পিতৃভক্তিতে বিমোহিত হইয়া বিমাতৃকৃত বিদ্বেষভাবের পরিবর্ত্তে তাঁহার সমধিক সম্মান করিতেন।

এই পরিবার মধ্যে তৎকালে অনেকগুলি বালকবালিকা ছিল। এতন্মধ্যে ঈশানচন্দ্রের আশৈশব এমত সদ্ভাবপ্রিয়তা গুণ ছিল যে, ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ-স্বভাব-সঙ্কুল বালদলে তাঁহাকে প্রীতি করিত; কেবল স্বগৃহবাসী বালকেরা নহে, প্রতিবেশবাসীগণের পুত্র কন্যারাও তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেমপূর্ণ নয়নে দৃষ্টি করিত। ক্রীড়া কালে বালকেরা তুমুল বাগাড়ম্বর করিয়া থাকে ও পরস্পর দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া মল্লবেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রহার পর্য্যন্ত করে, কিন্তু ঈশানচন্দ্রের সহচরেরা এতদূর স্বৈরাচার তাঁহার সম্মুখে করিতে পারিত না। সকলে অবশ্যই সময়ে সময়ে বালস্বভাব সুলভ হাস্য পরিহাস এবং ক্রীড়া কৌতুক করিত, ফলে যাহাতে দুর্ব্বুদ্ধির উদ্বোধ ও মনান্তরের সঞ্চার সম্ভাবিত

হইত এমত কার্য্য তদীয় বাল্যক্রীড়ায় এক কালেই হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে অষ্টবর্ষাতীত না হইতেই ঈশানচন্দ্র হিন্দুকালেজে প্রবিষ্ট হন। উক্ত বিদ্যালয় তৎকালে বঙ্গদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চতুষ্পাটী বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এবং কত শত কৃতবিদ্য যুবক তাহাতে বিদ্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া ভারতক্ষেত্রের পূর্ব্বার্জ্জিত সম্মান ও গৌরব রক্ষার্থ ক্রমশঃ সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক মাতৃভূমির রুদ্ধপ্রায় জ্ঞানরত্নের দ্বার মুক্তমুখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রায় এতদ্দেশের জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিমাত্রই বিশেষরূপে অবগত আছেন। এই বিদ্যাগারে তিনি যেরূপ শ্রমাতিশয় ও অধ্যবসায় সহ বিদ্যোপার্জ্জন করেন তাহাও তাঁহার সহাধ্যায়ী মহাশয়েরা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত পর্য্যন্ত যে যে শ্রেণীতে উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া সদাচরণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যান তাহাতে

তাঁহাকে সতীর্থ এবং শিক্ষক বর্গ একাগ্র হইয়া বলিতেন, যে তিনিই ছাত্রগণের সর্ব্বোত্তম। বিশেষ করিয়া অধ্যাপকেরা প্রশংসা করিতেন, অন্তেবাসিদিগের মধ্যে তিনিই নিরহঙ্কৃত, অনালস্য, শান্তস্বভাব, সদাচারী এবং প্রকৃতপাঠানুরক্ত সন্দেহ নাই। ঈশানবাবু হিন্দুকালেজে বাহুল্য রূপে তৎকালোচিত বিদ্যাবুদ্ধির উপচয় সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার অন্যতর উন্নতি কল্পে বিরত ছিলেন না, প্রত্যুত তদর্থে কতিপয় প্রসিদ্ধ ও নামলব্ধ ছাত্র সমবেত হইয়া একটি সভা সংস্থাপন করেন এবং উক্ত বিদ্বন্মণ্ডলী হইতে হিন্দুবার্ত্তাবহ নামধেয় একখানি মাসিক পত্রিকা কিছুকাল অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসহকারে প্রচারিত হয়। ঈশানবাবুর অন্যতর ভ্রাতা বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত, যিনি তদনন্তর কলিকাতার "আবগারীর" সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন, তিনি উক্ত বিদ্যারত্নমণ্ডলীর প্রধানতম রত্ন ছিলেন। এই সভার সভ্যশ্রেণীতে যে সকল

মহোদয়েরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে শোভমান হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত ও ধর্ম্মশীল। বাবু রাজকৃষ্ণ দেব, পার্ব্বতীচরণ সরকার এবং ভুবনমোহন মিত্র এই সভার সভ্য হন, ইহাঁরা কালেজেও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য ও গৌরবলব্ধ হয়েন ; কেন না হইবেন, তাঁহাদের সে সময়ের শিক্ষাদাতা বিলাতের পণ্ডিতচূড়ামনি টাইটলার, কারবীণ, এবং কাপ্তেন রিচার্ডশন সাহেব ছিলেন। এই সকল উদারাত্মন্ মহাভাগের অধ্যাপনাধীনে যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা সাহিত্যসংসারে যে অগ্রগণ্যরূপে পরিগণিত হন তাহা পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রেরা বিশেষরূপে ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, এমএ, পণ্ডিতগণ অগত্যা স্বীকার করিয়া থাকেন। একজন প্রধানতম রাজপুরুষ কহিয়াছিলেন যে ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, কালক্রমে তিনি এই ভারতরাজ্যের সমস্ত ব্যাপার বিস্মৃত হইবেন কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রমেও এরূপ চিন্তা

করেন না যে সৌভাগ্যজন্মা কাপ্তেন রিচার্ডশেন সাহেবের কৃত মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়ারের গ্রন্থ পাঠ কখন ভুলিবেন ? দেখ দেখি, এতত্তুল্য প্রশংসাবাদ ইদানীন্তনের কোন্ ইংরেজ পণ্ডিত লাভ করিতেছেন ? তাঁহার ছাত্রবৃন্দ কি ভাগ্যবান ? তাঁহারা উক্ত মহামহোপাধ্যায়ের অধ্যাপনায় সেক্‌স্‌পিয়ার পাঠ করিয়াছেন, সেই মহাকবির সুধাময় কবিত্বরস পান করিয়াছেন ও তাঁহার সহবাস এবং সদালাপে অধ্যয়নকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। পণ্ডিতের সহবাস স্বর্গবাসের তুল্য ; যখন তাঁহাদের সন্নিধানে কোন জ্ঞান জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন তখন তাঁহার মন হইতে সামান্য সাংসারিক চিন্তাসকল দূরে গমন করিতে থাকে, মহতী চিন্তা সকল উদিত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গোপম সুখদান করে সংশয় নাই। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ঈশান বাবু হিন্দুকালেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া "মেডিকেল" কালেজে প্রবিষ্ট হন এবং শেষোক্ত বিদ্যালয়ে

১৮৩৭ অব্দ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করাতে পুরস্কার স্বরূপ "ডিপ্লমা, সার্টফিকট, এবং গোল্ড-মেডেল" প্রাপ্ত হন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে ও বিনম্রভাবে উল্লিখিত বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ যথেষ্ট সম্প্রীত হইয়াছিলেন। এখানেও তিনি প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কাহার সহিত কলহ করেন নাই, প্রত্যুত সহবাসীরা যাহাতে স্ব স্ব অধ্যেতব্য গ্রন্থপাঠে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হন, তদুপদেশ বাক্যে ও আচরণের দ্বারায় প্রদর্শন করিতেন। যদি তাঁহার তদ্রূপ শুভোদ্দেশ্য উপদেশ পরম্পরার বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকে চলিতে না দেখিতেন তাহাতেও সেই হৃদ্‌গত মঙ্গল কামনা তাঁহার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক থাকিত ও উপযুক্ত কালপ্রাপ্ত হইলেই অসকৃৎ তদ্দানে বিমুখ হইতেন না। তাঁহার এই এক অলোক সামান্য মনোভিলাষ ছিল যে সকলের মঙ্গল হউক, স্বদেশের

লোক দেশান্তরে বিদ্যাবলে পরিচিত হউক, ও এ সংসারে সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করুক। মনুষ্য যদি গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া করিতে সক্ষম না হয় তবে কোথায় তাহার মনোন্নতি, কোথায় তাহার অধ্যয়ন ও কোথায় বা তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান হইবে? সে কেবল পশুর ন্যায় সামান্য অন্ন লাভার্থ ব্যাকুল হইয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির দ্বারে২ ভ্রমণ করিবে; কি অন্যবর্দ্ধিত হইয়া আত্ম জীবনের অধোগতি সম্পাদন করিবে! ফলে ইহার তুল্য মনুষ্যের আর কি দুর্ভাগ্য ঘটিতে পারে? এজন্য, তিনি ভুয়োভুয়ঃ আত্মীয় স্বগণ ও বয়স্যকে সাবধান করিতেন ও ইহাই কহিতেন যে প্রথমে স্বাবলম্বন করিতে চেষ্টা করা বিহিত; যদি তাহাতে কৃতকৃত্য হইতে পারা যায় তাহা হইলে গুরুতর সৎকর্ম্ম পরম্পরা করিতে অবসর পাইবে ও প্রকৃতার্থে তদনুসরণে সফল প্রযত্ন হইবে সংশয় নাই। দেখ মনঃ প্রসন্ন না হইলে কোন

গাঢ় চিন্তা করিতে পারা যায় না; যত মন দুশ্চিন্তা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবে তত তজ্জাত চিন্তা সকল পরিষ্কৃত হইয়া কাঙ্ক্ষিত ফলোদ্দেশ সকল করিয়া দিবে; অতএব প্রথমতঃ অন্নবস্ত্র লাভ করিতে চেষ্টা পাও তদনন্তর যে বিদ্যা উপার্জ্জন করা উপাদেয় জ্ঞান করিবে তল্লাভে কদাচই অকৃত কার্য্য হইবে না। কিন্তু ইহাতেও ভাবী সদনুষ্ঠানের বিঘ্ন করিতে পারে। প্রবৃত্তি একবার অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয় ভোগাভিলাষে আকৃষ্ট হইলে পরে তাহা হইতে তাহাকে নিষ্ক্রান্ত করা দুঃসাধ্যপ্রায় হয়, ইহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। কোন২ ব্যক্তি পাঠ গৃহে অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়া ও অশেষ প্রকার ভাবী শুভফলের প্রত্যাশা করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যান, তাহার পর সংসারের মোহিনী শক্তিতে এতাদৃশ কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকেন যে কালেজের তিনিই নহেন, তাঁহার মনোবৃত্তি এক কালে অন্য পথের পথিক হইয়া গিয়াছে;

ফলে ইহা কেবল অকিঞ্চিৎকর পদার্থে সাতিশয় প্রীতি করার দোষে সমুদ্ভূত হয়। মিথ্যাতে সত্য ভান ও সত্যতে মিথ্যা ভান করাতে মতিচ্ছন্ন হইয়া যায়; পদার্থ যাহা তাহাই থাকে। আমরা কল্পনা করিয়া একের গুণ অপরে আরোপ করি, সুতরাং যাহা সত্য তাহাই অসত্য ও যাহা অসত্য তাহাই সত্যজ্ঞান করিয়া অন্ধীভূত হইয়া যাই; অতএব পদার্থের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা জ্ঞান লাভের প্রথমানুষ্ঠান বোধ করা বিহিত। এই রূপ অবিচলিত পদার্থ জ্ঞান হৃদ্গত হইলে মনুষ্যের ভাবী জ্ঞানোপচয়ের পন্থা নিষ্কণ্টক হয়, সন্দেহ নাই।

মেডিকেল কালেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কলিকাতায় বিসূচিকা রোগ ভয়াবহ ও সর্ব্বধ্বংসীরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হওয়ায় "মেডিকেল কালেজের" কৃতবিদ্য ছাত্রগণ স্ব স্ব উপার্জ্জিত চিকিৎসাবিদ্যার পারদর্শিতা প্রদর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন্ ও সমৃদ্ধিশালী

বিস্তীর্ণ কলিকাতা নগরীর এক এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক এক জন উপস্থিত হইয়া উক্ত মহামারী নিবারণার্থ উদ্যোগ করেন। এই ভীষণরোগ-প্রতিবিধিৎসু ছাত্রবর্গের মধ্যে ঈশান বাবু এক জন গণনীয় হইয়াছিলেন, তিনি এই সুমহৎ কর্ম্ম সংসাধনার্থ পীড়াক্রান্ত ধনী ও নির্দ্ধনের দ্বারে দ্বারে অহর্নিশি ভ্রমণ করিতেন ও স্বার্থ বিরহিত হইয়া এবং আত্মজীবনের আশঙ্কা দূর করিয়া দরিদ্র বিশেষতঃ অচিকিৎসিত মৃত্যু-শয্যাশায়ী লোকের দুর্গন্ধ-পরিপূর্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অতৃপ্তিকর শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক প্রতি-কারোপযোগী ঔষধি মুহুর্মুহুঃ সেবন করাইতেন। এবম্বিধ আচরণ সাবধানতা সহকারে কিয়দ্দিবস করাতে বহু সংখ্যক নিরাশ্রয়ী ও নিঃস্ব ব্যক্তির জীবন রক্ষা করেন। বিশেষ অদাসসেবিত পীড়াক্রান্ত লোকের ঔষধ-পথ্যের আসাদন কল্পে যতদূর সাধ্য আনুকূল্য করিতেন। তাহা-দের মধ্যে যাহার কিঞ্চিৎ অর্থের সংস্থান

ছিল কিন্তু অভিভাবকের অভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাহরণের ব্যাঘাৎ হওয়া দেখিয়া সাধ্যমত স্বয়ং বা স্বভৃত্যের দ্বারায় তাহাদের তদ্বিধ অসদ্ভাবের নিরাকরণ করিয়া দিতেন, কারণ দেখিয়াছিলেন যে কাল রোগ তাহাতে ক্ষণার্দ্ধ ঔষধ সেবনে গৌণ হইলে প্রাণনাশের অনি-বার্য্যসম্ভাবনা ও আসাদানের অসদ্ভাব নিবন্ধন উপকারব্রতের বিঘ্ন হইলে তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার বিপরীত আচরণ করা হয়, এবং সাধ্যসত্ত্বে তাহা উপেক্ষা করিলে মনের দোষ জন্মে সুতরাং পাপ হয়। ঈশান বাবুর এই এক চিত্তের স্বাভাবিক গতি ছিল, তিনি যাহা সৎ বলিয়া জানিতেন তাহার অনুসরণ কল্পে বহ্বায়াস করিতেন এবং যত দিবস তাহা লাভ করিয়া অভি-লাষের চরিতার্থতা সম্পাদন না করিতেন তত দিবস তাঁহার চিত্ত অনন্যচেষ্ট হইয়া সেই দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিত। তিনি সর্ব্বদা ইহাই

কহিতেন যখন যে কার্য্যে ব্যাপৃত হইব তদুদ্দেশ্য অবশ্যই সফল করিব। যদি বেতনগ্রাহী হই তবে প্রভু যে নিয়মে ভৃতিদান করিতে সম্মত হইয়া থাকেন সেই নিয়ম অলঙ্ঘনীয় রূপে পালন করা বিহিত, অন্যথা প্রভু আমার কর্ম্ম বুঝিতে অশক্য হইলেও তাঁহাকে স্পষ্টাভিধানে বলা উচিত যে আমি মহাশয়ের নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী পালনে অসমর্থ হইয়াছি সুতরাং আমি বেতন লাভের যোগ্য নহি। এমত ন্যায়পরতা ও নির্ম্মলচিত্ততা এ সংসারে অতি বিরল। এ পৃথিবীতে এই প্রকার বহুজনের যুগপৎ সম্মিলন হইলে লোকের শোক সন্তাপ এক কালে তিরোহিত হইত ও সকলে বর্ণনাতীত ও অনাস্বাদিত সর্গীয় সুখ লালসা প্রকৃতার্থে ভোগ করিয়া পরম সুখী হইত। যিনি সৎকার্য্য বোধ হইলে আত্ম জীবন আহ্লাদপূর্ব্বক বিপদসলিলে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন, যিনি মৃত্যুশয্যা

শায়ী অকিঞ্চনের জীবনাশা উদ্রিক্ত করিয়া দেন ও তাহার প্রাণরক্ষার্থ আত্মবিদ্যাবুদ্ধি-প্রয়োগ করিয়া অর্থানুকূল্য দানে বিমুখ হয়েন না, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। ঈশান-বাবুর এতদাকারের বহুবিধ কার্য্য আছে, কিন্তু স্মারক-লিপির অভাবে আনুপূর্ব্বিক তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়াছি, যাহা কিছু দেখিয়াছি ও তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি তন্মাত্র ইহাতে লিখিত হইল।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে মেষ্টর এ, এফ, ডুনালী সাহেব মেদিনীপুর জেলার কালেক্টরী পদে নিযুক্ত হইয়া ঈশান বাবুকে ডিপুটিকালেক্টরী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন ও কথিত আছে যে এই পদলাভের সুযোগটী ডিপুটিকালেক্টর বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্তের উত্তরসাধকতা প্রযুক্ত সংঘটিত হয়। ফলতঃ ঈশান বাবু প্রার্থনানপেক্ষহইয়া ডিপুটিকালেক্টরী পদ প্রাপ্ত হওয়ায় চিকিৎসা ব্যবসায় এক কালে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া-

ছিলেন, এতচ্ছ্রবণে মেডিকেল কালেজের অধ্যাপকবর্গ বিশেষরূপে বিষাদিত হয়েন। তাঁহারা ঈশানচন্দ্রকে উক্ত কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বোত্তম ছাত্র জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষায় মর্য্যাদা দান করেন ও তদ্দ্বারায় কালেজের গৌরব বৃদ্ধি হইবে ইহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, অধিকন্তু ডাক্তর এইচ, এইচ, গুডিব সাহেব মহোদয় ঈশানচন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার অঙ্গীকার করেন; এই সকল সম্ভাবিত শুভ উপলক্ষের অন্তরায় হইল দেখিয়া তাঁহারা অতীব দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঈশান বাবুর ডিপুটিকালেক্টরী কর্ম্ম অঙ্গীকার সম্বন্ধে বিলক্ষণ ভ্রান্তি দেখা গিয়াছিল; তাঁহার ইংলণ্ড গমনের সুযোগ হইয়াছিল, দয়াবান গুডিব সাহেব তাঁহার মনোমত মিত্র হইয়াছিলেন, সুতরাং ইংলণ্ড হইতে কৃতবিদ্য হইয়া এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার অধিকতর গৌরব হইত সন্দেহ নাই। তাদৃশ

সুলভ মহদুপায় উপেক্ষা করিয়া তিনি যে সাধারণলভ্য ডিপুটিকালেক্টরী পদ স্বীকার করেন তাহা তাঁহার তাৎকালিক বিদ্যা বুদ্ধি ও উল্লিখিত সুলভ উপায় অবহেলনের সমীচীন হয় নাই; বিশেষতঃ তিনি যে প্রকার প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে ডিপুটিকালেক্টরীর ন্যায় পরাধীনতা তাঁহার অসহ্য জ্ঞান হওয়া প্রথমেই উচিত ছিল। তিনি তোষামোদ এককালে জানিতেন না, আপন গুণের পরিচয় দ্বিগুণিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না, সত্য বিষয় প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না ও প্রতিদিন কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব রাখিতে জানিতেন না; পক্ষান্তরে স্বপদের মান মর্য্যাদা বিলক্ষণ রক্ষা করিয়া যাইতেন ও স্বাবলম্বিত কার্য্যটি অসাধারণ নৈপুণ্য ও অক্ষান্ত পরিশ্রম সহ নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তিনি ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে নিযুক্ত হইয়া

৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ পদে অভিষিক্ত থাকেন ও তন্নিবন্ধন যখন যে কার্য্যে নিযোজিত হইতেন তাহা সুচারু রূপে সম্পাদন করিয়া অতীব প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন; তথাচ তাঁহার পদোন্নতি অসাধারণরূপে হয় নাই; প্রায় লভ্য পুরস্কার ফলশূন্য প্রতিষ্ঠায় পর্য্যাপ্ত হইত। এইরূপে সুদীর্ঘকাল বিগতান্তে অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রেণীতে সমুন্নত হইতেন। এই প্রকারে উন্নতির স্থবিরগতি সমীক্ষণ করিয়া কখন কখন ত্যক্ত হইতেন বটে, কিন্তু তিনি প্রার্থিব কোন অনভ্যুদয়ে ম্রিয়মান হইতেন না। তাঁহার যে অবিচলিত শান্ত স্বভাব ছিল তাহা সর্ব্বদা তদীয় মুখমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকিত ও আন্তরিক মনোবিকার কাহার নিকট ব্যক্ত করিতেন না এবং তাঁহার বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া কেহই তাঁহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিত না। আমি অনেক বার তাঁহার ভৃত্যগণকে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারাও

প্রভুর মনস্তুষ্টি বা মনস্তাপ কি করিলে হয় তাহার সদুত্তর দিতে পারিত না, তবে এতন্মাত্র বলিত যে বিরক্ত হইলে ক্ষণকাল স্তব্ধ বা মৌনী হইয়া থাকেন। ঘটনাক্রমে এক দিবস বাবুর তদ্রূপাবস্থা কালে আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দ্বারদেশস্থিত ভৃত্যকে কহিয়াছিলাম, বাবু কোথায়? সে তদুত্তরে কহে তিনি অদ্য অসন্তুষ্ট আছেন। ভৃত্য এই উত্তরটি অনতিহ্রস্ব স্বরে দেওয়ায় ঈশান বাবু পরিস্ফুট রূপে তাহা আকর্ণন করিয়া প্রীতিপূর্ণান্তঃকরণে আমার নিকট উপস্থিত হন ও হস্ত ধারণ করিয়া আমায় গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যান। আমি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া কহিয়াছিলাম মহাশয় অদ্য কি বিষণ্ণ ভাবে ছিলেন? প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন কই ভাই আমিত তাহার কিছুতই জানি না; তবে চাকরেরা যখন আমায় নীরব দেখে তখনই আমার মনঃপীড়ার ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। তুমিত জ্ঞাত আছ আমি অধি-

কতর বাক্যব্যয় করা অপেক্ষা চিন্তা করিতে ভাল বাসি ; সচিন্ত হইলে মনুষ্যের অনেক উপকার হয়। তাহারা সাংসারিক অবশ্যম্ভাবী বিপৎ-পাত সকলের সহজেই প্রতিকার করিতে পারে। দেখ, যদি অপর ব্যক্তির দৈব বিড়ম্বনা আমরা চিন্তাপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করি, তবে তাদৃশ বিপদ্ ঘটনা আমাদের হইলেও হইতে পারে ইহা অভ্যস্ত হইয়া যায়, ও আমরা সেই বিপদ্ কালে প্রশস্ত চিত্তে থাকিতে পারি এবং তদ্রূপ সম্ভাবিত ও চিন্তিত বিপদে আমাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য করিতে পারে না ও গাঢ়রূপে চিত্তের বৈকল্য সাধনেও সমর্থ হয় না। চিন্তা করা অভ্যস্ত হইলে তদন্য-শরণের চেষ্টা নিরতিশয় হইয়া উঠে, প্রত্যুত কি আহার কি বিহার, কি প্রাতঃ কি প্রদোষ সকল কালেই অশেষ প্রকার চিন্তার্হ পদার্থ চিন্তাকুশল ব্যক্তির দৃষ্টি-অগ্রে বিদ্যমান থাকে। তিনি তাহার যেটী আন্দোলন করিতে অভি-

লাষী হন তাহাতেই তিনি কত প্রকার সুখলাভ করিয়া আত্মপ্রসাদের উন্নতি সাধন করিতে পারেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বালার্ক দর্শন করিয়া মনের যে ভাব হয়, মধ্যাহ্ন কালের বিভাবসু সমীক্ষণে তদ্ভাবের বৈচিত্র সাধন করে ; আবার ভাস্করের অস্তাচলাবলম্বন রূপ দর্শন করিলে বালভানু সদৃশরূপে তাহায় অস্তমিত হইতে দেখা যায় ; নরজাতির আদ্যন্ত মধ্যম, সূর্য্যের দৈনিক অবস্থা ত্রিতয়ের ন্যায়, প্রথমে সুশ্রী, সুকুমার ও নয়নানন্দদায়ী, মধ্যে উগ্র ও দুর্দ্ধর্ষ ও শেষে গম্ভীর, শান্ত ও মলীন। অতএব যে অল্পকালের জন্য দেহ ধারণ করা হইয়াছে ও শরীর যে উপাদানে প্রাদুর্ভুত ও যেরূপে তিরোহিত হয় তাহাই কেবল চিন্তা করিলে মনুষ্যের কিয়ৎ কালের আমোদ আহ্লাদে অনুমোদন করা অপেক্ষা তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা ভাল। তিনি ইত্যাদি কহিলে আমি তর্কব্যপদেশে তাঁহায়

কহিয়াছিলাম যে মহাশয় আপনকার মীমাংসা-পরতন্ত্র হইয়া চলিতে হইলে পার্থিব সর্ব্ববিধ আমোদ ও উৎসবাদি এক কালে পরিত্যাগ করিতে হয়। তদুপলক্ষে তিনি বিস্তর প্রসঙ্গ করেন তাহা দীর্ঘকালাতীত হওয়ায় স্মৃতিপথ হইতে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু, তাহার যে যে অংশ আমি প্রিয়জ্ঞানে আলোচনা করিতাম তাহা অদ্যাপি মনোভাণ্ডারে সঞ্চিত-নিধির ন্যায় রহিয়াছে। তাহার প্রথম এই ভাব ;—কতকগুলি বাদ্যকর, গায়ক এবং নর্ত্তককে এক দিবস রজনীতে আহ্বান করিলে তাহারা নির্দ্দিষ্ট কালে তোমার নিদেশানুসারে প্রস্তুতীকৃত বন্ধুজনাকীর্ণ আসরে আগমনের পর যন্ত্রাদি তান লয়সহ মিলাইতে মিলাইতে নিশীতকাল হইল, তুমি প্রতীক্ষাই করিতেছ কখন্ অভিনায়কেরা গীতারম্ভ করিবে ও মধ্যে মধ্যে নিদ্রাবশে জৃম্ভণ করিতে লাগিলে, চক্ষু তৎস্বভাব বলে ক্ষণে ক্ষণে নিমীলিত হইতে থাকিল ; ফলে,

কালগৌণ নিবন্ধন তোমার যাত্রা শ্রবণজন্য যে উৎসাহসহ কৌতুক ছিল, তাহার লাঘব হইল। এক্ষণে দেখ মনের এমত স্বভাব নহে যে একটি বিষয় প্রাপ্ত না হইলে প্রাক্‌লব্ধ বিষয়টি ত্যাগ করে। ভাল, যখন যাত্রাকর নিমন্ত্রণ করা উত্তম কর্ম্ম হয় নাই, এইরূপ তোমার মনে আন্দোলিত হইতে লাগিল, তখন মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে যাত্রা ভিন্ন অন্যতর আমোদ করা ভাল ইহা অবশ্যই সিদ্ধান্ত হইল সন্দেহ নাই। তদনন্তর সে দিবস মহাকষ্ট হইলেও বন্ধুবর্গের অনুরোধে গীত বাদ্য শ্রবণ করিয়া ও নর্ত্তকের নৃত্য দেখিয়া নিশাশেষ করিলে কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যাত্রাভিনয় দেখিলে যে মনঃপ্রীতির চরিতার্থ করিবে ভাবিয়াছিলে তাহা একবারে মন হইতে দূরীকৃত হইল, পুনরায় অন্য আমোদের অন্বেষণ করিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলে। পরে যেন স্থির হইল সুহৃদ্ সমভিব্যাহারে দ্যূতক্রীড়া করিলে আমোদ হইতে পারে ; বন্ধুবর্গও

তোমার বাটীতে সতত থাকেন, তাঁহারা তোমার অভিরুচি জানিয়া ক্রীড়াসামগ্রী অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, বৈতনিক ভৃত্যগণ কর্ত্তা অক্ষক্রীড়া করিবেন ইহার সন্ধান পাইয়াই ব্যস্তসমস্ত ভাবে উপযুক্ত আস্তরণ করিয়া তদুপরি তাম্বুলপাত্র সংস্থাপন ও তোমার উপবেশন যোগ্যস্থানস্পর্শে বৃহদাকার একটী উপধান রাখিয়া দিল। ভাব, তুমি গৃহস্বামী অথচ সান্ন লোক; আহারাদি করিয়া ক্রীড়াগারে অগ্রেই উপবিষ্ট হইলে, ক্রীড়ালিপ্সু সকলের অবস্থা এক প্রকার নহে, কেহ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন কেহ বা কষ্টাতিশয়ে দুর্ভার সংসার ভার বহন করিতে বাধ্য হন। এমত অযোগ্যাবস্থ ব্যক্তিগণের এককালে সম্মিলন হওয়া দুর্ঘট, সুতরাং ক্রমে আর দুজন ক্রীড়াসনে আসীন হইলেন, তৃতীয় ব্যক্তির আগমন প্রত্যাশায় তোমার ক্লেশ উপলব্ধি হইতে লাগিল ও ইত্যবসরে তুমি নিদ্রাভিভূত

হইয়া গেলে। তদনন্তর তৃতীয় জন আগমন করিয়া দেখিলেন বাবু নিদ্রাবেশে আছেন; ব্যর্থ ক্রীড়াশক্তির অনুরোধে তাঁহাকে বিরক্ত করা প্রয়োজন কি বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; পরে তুমি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলে কেহই বিদ্যমান নাই। কিন্তু পরদিবস সকলেই ক্রীড়াশক্তির প্রাবল্যবলে তোমার মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্তির পূর্ব্বেই আসিয়া একাসনে আসীন হইয়া রহিলেন; তুমিও আচমনের পর ক্রীড়াগারে উপস্থিত ও অনপেক্ষিত পূর্ণসম্প্রদায় হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করিলে। ক্রীড়া করিতে করিতে বিজয়ীদল বিজিতদলকে ব্যঙ্গ করে ইহা দুরোদর ক্রীড়ায় নিশ্চিত ফল হওয়াতে তাহাও চলিতে লাগিল ও সেই আসনেই তোমাদের অতিশয় ক্রোধ প্রভৃতি রিপু প্রবল হইল। উক্তদলে তুমি অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ; তুমি দেখিলে কি দুর্ব্বোধের কর্ম্মেই আমরা প্রবৃত্ত হইয়া মানবাচারের বিপরীত আচরণ

করিতেছি। দূর হউক গত দিবসটি নিষ্কর্ম্মে ব্যয় করিয়াও এতাদৃক্ মনের অসন্তোষ লাভ করি-নাই; অদ্য আমোদ ইচ্ছার চরিতার্থ করিব বলিয়া খেলা করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহারত সকলই হইল, তবে এই শিক্ষা হইল যে মনুষ্যের কদাচই উচিত নহে, যে কার্য্যে জ্ঞানোন্নতির লাভ না করে, তন্নিবন্ধন কালক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয়। কালই আমাদের জীবনধন, এমন রত্ন ব্যর্থ অপহৃত হইতে দেখিলে আর কি থাকিবে যে তাহার যত্ন করিবে, এজন্য সকলেরই প্রীতমনে জ্ঞানা-লোচনা করা কর্ত্তব্য তাহাতে যদ্বিধ সুখের প্রত্যাশা আছে, তাহার শতাংশের একাংশও অন্যতর ইন্দ্রিয়ভোগ্য আমোদে লাভ হয় না বরঞ্চ অভিহিত জ্ঞাননিধি লাভার্থ যে কাল ব্যয় হয় তাহাই জীবনের সাফল্য সিদ্ধি করি-য়াছে ও তদিতর আমোদসম্ভব কার্য্যে যে কালক্ষেপ হইয়াছে তাহাতে অনুশোচনা করিতে ও আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মান হইতে হয় ইত্যাদি

বহুবিধ প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা ঈশান বাবু স্বীয় মানসিক সারবত্তা সপ্রমান করিতেন।

ঈশান বাবু সুদীর্ঘ কাল "সরবে" সংক্রান্ত ডিপুটিকলেক্টরী কর্ম্মে নিযোজিত ছিলেন এবং তৎকর্ম্ম সূত্রে প্রায় বঙ্গদেশের সমস্ত জেলার গ্রাম, অটবী ও গিরি গুহা পর্য্য-টন করিতে বাধ্য হন। এই প্রকার বহু কষ্টে চিরপ্রোষিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম ধ্যান ও জ্ঞান করিয়া জীবনের স্থূলাংশ অতি-পাতকরেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে সময়ে "গবর্ণমেণ্ট" ডিপুটিকালেক্টর প্রভৃতির শ্রেণী শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন তৎকালে ঈশান বাবুকেই নির্ব্বাচন করিয়া সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এরূপ বিচার তাঁহার সম্বন্ধে অতীব অনুপযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির অভাব ছিল না, কর্ম্ম প্রিয়তাগুণও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, বরঞ্চ তৎতুল্য গুণাধার ব্যক্তি প্রায় তদানীন্তন ঐ রূপ পদে পদদ্বই

ছিলেন না তথাচ যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নয়নানন্দকারী ছিলেন তাঁহারা অনায়াসে তুঙ্গতর শ্রেণী প্রাপ্ত হন, তিনি ভাগ্যে ভাগ্যে ডিপুটিকালেক্টরী পদের কনিষ্ঠাতিকনিষ্ঠ হইয়া তদুপযুক্ত শ্রেণীস্থ হয়েন। কিন্তু ইহাতে কি হইবে ? তাঁহার সহিষ্ণুতার সীমা ছিলনা ; তিনি এবম্বিধ প্রকাশ্য অবিচারের প্রতিবিধানার্থ কোন উদ্যোগ কি আত্মকৃত কার্য্যের গৌরব প্রকাশ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগের কর্ণগোচর করা পর্য্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ফলে এই প্রকার মনের লোক কোথায় এ সংসারে উচ্চপদের অধিকারী হইবে ! পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ডিপুটিকালেক্টরী গ্রহণ করাতে তাঁহার সমূহ ভ্রান্তি ছিল কারণ যে গুণে তিনি গুনী ছিলেন তাহার পরীক্ষা নিয়ন্তৃগণ করিতেন না, তাঁহারা যে লোকাতীত সম্মান তত্তুল্য পদস্থ ব্যক্তির নিকট লাভ করিতেন ঈশান বাবুর আচরণে তাহার বহুলাংশে ন্যূনতা দেখিতেন সুতরাং তাঁহার কর্ম্মের দোষ

অপ্রাপ্ত প্রযুক্ত প্রকাশ্যে কোন অহিতেচ্ছা ব্যক্ত না করিলেও তাঁহার উন্নতির প্রতিবন্ধকতা করিতেন, ইহা তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। ফলে ঈশান বাবু আত্মজ্ঞানে যাহা অকরণীয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার বিপরীত কার্য্য কদাচই করিতেন না, ইহাতেই তাঁহার পদবৃদ্ধির অন্তরায় সম্পাদন করে ও দীর্ঘকাল পরে ক্রমোন্নত সোপান আরোহণ করিতে করিতে বহু কাল ব্যয় হইয়া যাইত ; এমন কি ১৮৩৮ শালে নিযুক্ত হইয়া ১৮৬১ অব্দ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ৫০০৲ শত টাকা মাসিক বেতনে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়েন, ইহাতেই তাঁহার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়া যায় ; অথচ তদীয় কর্ম্ম সম্ভব ফল দৃষ্টে বর্ষে বর্ষে জেলার "কালেক্টর ও সরবে সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট" সাহেবগণ বার্ষিক কর্ম্ম প্রদর্শনী পত্রে তাঁহার গুণগ্রাম উল্লেখ করিয়া ও অসামান্য পারদর্শিতা বর্ণন পূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা

লিখিতেন। কিন্তু তদ্দ্বারায় অভিলষিত ফল লাভ না হওয়াতে হতাশ প্রায় হইতেন, তথাপি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না।

পরিশেষে তিনি সরবে ডিপুটিকালেক্টরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধারণ প্রণালীর ডিপুটি-কালেক্টরীতে পরিবর্ত্তিত হইতে যত্নাতিশয় করিয়াছিলেন ফলতঃ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দভাব না থাকায় কেহই তদনুমোদনে যত্ন করেন নাই সুতরাং তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি কখন কখন গেজেটে তাঁহার পর নিযুক্ত ডিপুটিকালেক্টর দিগের এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নত দেখিয়া কহিতেন, এব্যক্তিটি যুবকতাহার উন্নতি লাভ হওয়ায় সুখী হইলাম; কিন্তু কি বিদ্যা-বলে পদবৃদ্ধি হয়, তাহার গুঢ় কারণ কি, ইহা যদি জানিতে পারিতাম তাহা হইলে আরও সুখী হইতাম, কারণ কেবল সযত্নে কর্ম্ম করায় পদবৃদ্ধি হয় না ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া

দেখিয়াছি, সুতরাং কারণান্তর আছে তাহার আর সংশয় নাই। আমি যে যে সাহেবের অধীনস্থ হইয়া সুদীর্ঘকাল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছি সকলেই আমার কৃত কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া কেবল তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়া নিশ্চেষ্ট হয়েন নাই, তাঁহারা যতদূর পারেন তত্তাবৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লিখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়াছিলেন, অতএব তৎকল্পে তাহাই পর্য্যাপ্ত হইলে এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ কাল সরকারী কর্ম্মে ব্যয় করিয়া কোথায় ফল পাইলাম, ইহাতেই আমি স্থির সিদ্ধান্ত করি-য়াছি উচ্চপদবীর রাজপুরুষেরা অধীনস্থ ব্যক্তির নিকট যাহা পাইবার ইচ্ছা করেন তাহাই যে ভাগ্যবান জানিয়া বিধান করিতে পারেন তাঁহার পদোন্নতি অনতি-বিলম্বে ও অনিবার্য্যরূপে হইবে। ফলে সে একটী স্বতন্ত্র বিদ্যা, তাহা অনেক ব্যক্তির আছে ও আমিও তাহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছি, কিন্তু তদনুযায়ী চলিতে ঘৃণা

করি সুতরাং পারি না, পারিলে, কেন আর দেশ দেশান্তরে অশ্রুত ও অনাদৃত হইয়া পর্য্যটন করিব!

১৮৫৪ খৃঃ অব্দের বর্ষাকালে মহিমার্ণব লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত হালিডে সাহেব বাহাদুর সেক্রেটরী ডবলিউ গ্রে সাহেব মহোদয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া জলপথে বহরমপুরে উপনীত হয়েন; তাঁহাদের আগমন বার্ত্তায় সপ্তক্রোশব্যাপিনী মুরশিদাবাদ নগরী শব্দায়মান হয়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশপ্রধান শ্রীযুক্ত নওয়াব নাজিম বাহাদুর তাঁহাদের প্রত্যুদ্‌গমনার্থ যে সমগ্র উদ্যোগ করেন তাহা প্রভূত ও প্রশংসনীয়। ঐ নগরের রাজপথ সমস্ত লোকাকীর্ণ হইল, শকটাদির ঘর্ঘর শব্দে ও তোপধ্বনিতে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল, তদনন্তর উক্ত প্রধানতম রাজপুরুষেরা নগরের মুখোজ্জ্বলস্বরূপ নওয়াব নাজিম বাহাদুরের প্রাসাদ পরিদর্শন পূর্ব্বক তথায় পরস্পর সম্মান প্রদর্শন ও

সদালাপের পর বহরমপুরে প্রত্যাগমনানন্তর একটী দরবার করণের আদেশ করেন। তাঁহাদের এই আজ্ঞা মাত্র প্রয়োজনীয় স্থান নির্দ্দিষ্ট ও তদুপযুক্ত দ্রব্য ও আসনাদি আনীত ও এবং বিস্তীর্ণপটগৃহের যথাস্থানে বিন্যস্ত হইল। এই "দরবার" পটগৃহে প্রথমে গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত কর্ম্মকর্ত্তা, তদনন্তর অচিহ্নিত প্রধান সদর আমীন ও ডিপুটিকালেক্টর গণ প্রবেশাধিকারী হইয়াছিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত সাহেব উক্ত সাহেবদিগের সহচর স্বরূপ নৈমিত্তিক কালের জন্য আগমন করেন; তিনি পটমণ্ডপের দ্বারদেশে প্রতিহারী-বেশে উপবিষ্ট হইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তির এক একজন করিয়া গৃহপ্রবেশের আদেশ প্রদান করিতেছিলেন। পরে অভ্যন্তরিত ব্যক্তি বহিষ্কৃত হইলে অপর একজন গমন করিতেছিলেন; এবম্প্রকার প্রণালীতে বন্ধুজনের গমন বহির্গমণ হইলে ঈশান বাবু উক্ত সাহেবের অভিমুখীন হন, সাহেব, বাবুর পরিচিত; বলিতে

কি তাঁহার অধীনে তিনি কিছুকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সাহেব অবশ্যকরণীয় কোন সম্ভাষণ না করিয়া বাবুকে কহেন, "ঈশান চন্দ্র এক্ষণেও কি পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম করিতেছ?" বাবু প্রত্যুৎপন্নমতি সহবারে উত্তর দেন "মহাশয় যেমন পূর্ব্বে আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন সেইরূপ কি অধীনস্থ লোকদিগের প্রতি করিয়া থাকেন?" ইহাতে সাহেব এককালে নীরব হন, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহেন, ক্ষমাকর আমি সহসা তোমায় দেখিয়া করণীয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম; বিশেষতঃ তোমার সহিত আমার বিসম্বাদ-নিবন্ধন যে সমস্ত লেখা পড়া হয়, তাহাতে তোমারই মত বোর্ড প্রকৃতবোধে অনুমোদন করেন ও তুমি জয়যুক্ত ও আমি পরাভূত হই, ইহাতে আমার কর্ত্তব্য ছিল যে সেই অসুখজাত ব্যাপার এককালে বিস্মৃত হইয়া যাই। বাবু ক্ষণকাল পরে সাহেব কে এই বলিয়া গবর্ণর সাহেবের গৃহে গমন করেন যে

মহাশয়ের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল তাহা অন্যত্রে হইলে আমি অপেক্ষাকৃত শান্তচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে পারিতাম; অধিকন্তু আমি অভ্যাগত ব্যক্তি নহি, নিমন্ত্রিত; এমত স্থলে মহাশয়ের এই ব্যবহারে অধিকার চর্চ্চা হয় নাই; ইহা আমি অবশ্য বলিতে পারি।

লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ঈশান বাবুকে জানিতেন, তিনি নানামত সদালাপ করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিলেন। ঈশান বাবু রাজদ্বারেই হউক কি দরিদ্রেধামেই হউক, কখন পুরুষাকার বিস্মৃত কি চলচ্চিত্ত হইতেন না; বিপদে তাঁহার মুখাকার যে শ্রীতে দৃষ্ট হইত সম্পদে তাহা হইতে উজ্জ্বল দেখাইত না। এই তাঁহার মহত্ত্ব এবং তাঁহার যে দৃঢ় সত্যব্রত ছিল তাহা লোকালয়ে অতি বিরল। সত্যবাদী অজ্ঞানীকে তিনি সমাদর করিতেন, অনৃতাচারী পণ্ডিত তাঁহার সন্নিধানে তত্তুল্য সমাদৃত হইতেন না। বহুবাক্য ভাষণে

সত্য প্রসঙ্গের লোপাপত্তি হয় ইহা তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল ও তন্নিমিত্তই এককালে বহুজনের সহবাস তাঁহার প্রিয় ছিল না ও কেবল সেই জন্যই তিনি যে যে নগরে কর্ম্ম সূত্রে বাস করিতেন তন্নগরীর পর্য্যন্তদেশে নৈমিত্তিক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেন। ১৮৫২ কি ১৮৫৩ খৃঃঅব্দে ভগলপুর অঞ্চল হইতে বহরমপুর আগমন পূর্ব্বক এই নগরীর প্রান্তে একটি সুপ্রশস্ত বাসগৃহ স্থির করিয়া লয়েন। আমি ইহার পূর্ব্বে ঈশান বাবুকে জানিতাম না; এক দিবস সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের "আফিষে" আগমন করিয়া তত্রোপস্থিত বাবু তারক নাথ ঘোষ ডিপুটিকালেক্টরের সহিত সরকারী কর্ম্ম সম্বন্ধের কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন; তারক নাথ বাবু পূর্ব্ব হইতেই আমায় বিলক্ষণ প্রীতি করিতেন, ঈশান বাবু তাঁহার বন্ধু হওয়া প্রযুক্ত আমাকে তাঁহার সহিত সেই ক্ষণেই

পরিচিত করিয়া দেন। ঈশান বাবুর সহিত সাক্ষাৎ লাভের দিবস হইতে আমার বিবিধ প্রকার উপকার হয়, তন্মধ্যে জ্ঞানেচ্ছা এতাদৃশ তেজস্বিনী হইয়া উঠে যে পুস্তকপাঠে আমার নিরতিশয় বিরতি সত্ত্বেও তাঁহার সহবাস নিবন্ধন তাহা ক্রমশঃ অপনীত হইয়া যায় ও যতক্ষণ সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যয় হইত তদিতর কালে পুস্তক পাঠ করিতে ক্লেশ জ্ঞান করিতাম না এবং গ্রন্থপাঠে ইচ্ছাতিশয় হওয়াতে নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিতে হইলে পূর্ব্বে যে সঙ্গলাভের অভিলাষ হইত তাহাও উত্তরোত্তর দূরীকৃত হইয়া গেল। ঈশান বাবু অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর একাকী বাটীর মধ্যস্থিত পুষ্পোদ্যানের আলবাল মালায় পরিভ্রমণ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্লান্তি অনুভব হইলেই উদ্যানের উপান্তদেশে স্থিরচিত্ত হইয়া উপবেশন করিতেন। এই প্রকার নিত্যকর্ম্মটি প্রাতঃ প্রদোষে পার্য্য-

মানে কদাচই অবহেলন করিতেন না; এমন কি অপ্রতীক্ষিত রূপে কোন বন্ধুজনের আগমন দ্বারায় তাহার প্রতিবন্ধক হইলে, ইহাতে নিশ্চিতই প্রতীয়মান হইত যে দিবা ও রজনীর প্রারম্ভে তিনি ঈশ্বরোপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রন্থপাঠ বা অধীনস্থ কোন সরকারী লোক উপস্থিত হইলে সেই দিবা সংক্রান্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্নান ভোজনের পর সরকারী কর্ম্মে একমনা ও এককর্ম্মা হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি উক্ত কালের মধ্যে গৃহ কর্ম্মের বিশেষ হানি দেখিলেও তাহাতে দৃক্‌পাত করিতেন না এবং মোক্তার বা উকীল তাঁহার বিচার আসনের অভিমুখীন হইয়া কোনরূপে ব্যর্থ কথার আন্দোলন করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা করিতে উৎসাহিত হইত না ও আসনে উপবিষ্ট হইলে দৈনিক করণীয় কর্ম্ম অসম্পূর্ণ

থাকিতে তাহা ত্যাগ করিতেন না। তাঁহার সম্মুখে অনুপযুক্ত কথা লইয়া যে দ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বী কি তাহাদের প্রতিনিধিগণ অনর্থক কালহরণে সামর্থ্য বিরহিত হইত, তাহাতে তাহাদের উপকার হইত, কারণ তাহারা দেখিত অন্যান্য আদালতের বিচারকর্ত্তারা কর্ম্মের সময় ইতস্ততঃ কথাবার্ত্তা লইয়া কাল হরণে পদোচিত ব্যবহার না করায় তাঁহাদের যেমন কর্ম্মের ক্ষতি হইত, তাঁহাদের সম্মুখে যে সকল বিচারপ্রার্থী লোক উপস্থিত হইত তাহারাও তেমনি নিষ্কর্ম্মে কাল নষ্ট হওয়া দেখিয়া ত্যক্ত হইত সন্দেহ নাই। আমি অসকৃৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম, মোক্তারগণ একান্ত হইয়া কহিত যে গবর্ণমেণ্টের একি বিপরীত বিচার, ঈশান বাবু শৈল, কন্দর, এবং অরণ্যানী পরিমাণ করিতেছেন অন্যেরা প্রাড়্‌বিবাকের আসন গ্রহণ করিয়া বিচারপদ্ধতির অবমাননা করিতেছেন; অতএব পদ সকলের যোগ্যাযোগ্য পাত্র মনোনীত

সম্ভব দোষে কোন কর্ম্ম বাঞ্ছনীয় ফলে ফলীন হইতেছে না। এইরূপে যিনি পণ্ডিত তিনি কারাগারের তত্ত্বাবধায়কতা করিতেছেন, যিনি বীরপ্রধান তিনি লেখনী ধারণ করিয়া পত্রাবলী রচনা করিতেছেন এবং যিনি দুর্ব্বল ও নিরীহ তিনি শান্তিরক্ষার অস্ত্র ধারণ করিয়া নগরের রক্ষণী হইতেছেন এই সমস্ত বিষম রীতি প্রধান প্রধান বীর পুরুষেরা অতর্কিতরূপে বা স্বগণের পরিতোষার্থ প্রণয়ন করিতেছেন, ফলতঃ তাহা কিছু সূক্ষ্মদর্শী "ব্রিটীশ রাজ নিয়মের প্রণীত কি তদনুযায়িনী নহে, তাহা অভিহিত অবিমৃষ্যকারিতা দোষে হইতেছে কিন্তু তন্নিবন্ধন যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রকৃতিকুলের বিলক্ষণ অনিষ্ট সম্ভাবনা হইতেছে তাহা অদূরদর্শী রাজনীতি ব্যবস্থাপকেরা" অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে।

ঈশান বাবু একবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে

রিণয় ব্রতে ব্রতী হন, তিনি তৎকাল হইতে হধর্ম্মিণীর প্রতি অতীব অনুরাগী ছিলেন, ফলে চিরপ্রোষিত পদে পদস্থ ছিলেন তাহাতে র্ব্বদা সেই প্রণয়পবিত্র ভার্য্যার সহবাস খে সুখী হইতে পারিতেন না; কিন্তু, প্রকৃত প্রমের যে মহীয়সী আকর্ষণা শক্তি আছে াহাতে তাঁহাদের পরস্পর সম্মিলন করিয়া দিত ও সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই ঈশান বাবু রিবার সহবাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ যোগেশচন্দ্র, মধ্যম মেশচন্দ্র ও কনিষ্ঠ অবিনাশ চন্দ্র। ঈশান বাবু কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ পৌরুষাকার কলেবর ধারণ রিতেন; তিনি দয়াবান ছিলেন অথচ মিতব্যয়িতাসহ কালযাপন করিতেন, আড়ম্বর করিয়া তাঁহার কখন কাহাকে কোন অর্থদান করিতে দেখিনাই, ইহাতেই তাঁহাকে লোকে কৃপণাশয়ের লোক বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু একটি ঘটনা আমার সাক্ষাৎকারে সংঘটিত হয়, তদ্দ্বা-

রায় তাঁহার সহৃদয়তা বিপন্ন জনের প্রতি স্ব
প্রবর্ত্তিত হইত ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একা
তিনি বীরভুম হইতে বর্দ্ধমান জেলা সংক্রা
ভাগীরথীর পার্শ্বশায়ী কাটয়া নগরে আগম
করেন, কাটয়া সিউড়ি হইতে প্রায় চতুর্ব্বিং
শতি ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইবে; তিনি ষোল জ
জাল্মস্কন্ধ ব্যতীত প্রায় গমনাগমন করিতে
পারিতেন না; সিউড়ি হইতে ষোল জন
লইয়া আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বীরভুম প্রভৃতি
বনময় প্রদেশে, অতি সুলভ ভাটকে বেহার
প্রাপ্ত হওয়া যাইত; বলিতে কি তিনি প্রতি যা
বাহকের দৈনিক বেতন ৵০ দুই আনা স্থি
করিয়া কাটয়া আগমন করেন। সন্ধ্যার সম
সিউড়ি হইতে যাত্রা করিয়া পর দিবস সূর্য্যো
দয়ের পরই কাটয়া আগমন করাতে এ
দিবসের ১৬ ষোলজন বেহারার বেতন ২৲ দু
টাকা মাত্র হইল দেখিয়া ক্ষণকাল অবাক হইয়
থাকেন, ইত্যবসরে বেহারারা "বাবুজি মহা

য় বিদায় করিয়া দিলে আমরা চলিয়া যাই"
ত্যাদি বারম্বার বলিতে ছিল, ঈশান বাবু
ই সময়ে স্বগত হইয়া তৎসংক্রান্ত কতই
ন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবেন আমি
প্রতিদিবস প্রায় ২০ বিংশতি মুদ্রা বেতন
াইয়া থাকি তাহাতেই আমার ধনতৃষ্ণার
প্তিসাধন হয় না। হায়! এ ষোল জন লোক
শেষ প্রকার কষ্ট করিয়া ও অসহ্য ভার
হনের পর এক দিবসে কেবল ২৲ দুটি টাকা
প্রাপ্ত হইবে! হায়! অর্থাভাবে মনুষ্যকে
শুতুল্যাবস্থায় পরিণত করে। দেখ, যদি,
তাহারা অলক্ষিতরূপে কতকগুলি টাকা এখনই
লাভ করে তাহা হইলে যানারোহণ পূর্ব্বক
আমার ন্যায় গমন করিতে কেনই বা অসমর্থ
হইবে।

বেহারাদের সহিত মনুষ্যাকার গত আমার
কোন ভেদ নাই, তবে কারণ সহকারে অর্থোপা-
র্জ্জনের পন্থা আমার অপেক্ষাকৃত আয়ত্ব

হইয়াছে, ইহাতেই তাহাদিগকে কি নিকৃষ্ট ম
করা বিহিত ? হায় ! ইহারাও স্ব স্ব পরিবা
বর্গকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এতচ্চিন্ত
সাশ্রুনয়ন হইয়া বাক্স হইতে ১৬টি মুদ্রা বা
করত প্রতি জনকে ১ এক টাকা করি
দেওয়াতে তাহারা আহ্লাদ সাগরে পরিপ্ল
হইল, ও বাবুর অদৃষ্টপূর্ব্ব বদান্যতা দর্শ
"তাঁহার জয় হউক" এই কীর্ত্তন করিতে করি
গন্তব্য পথে প্রয়াণ করিল। ঈশান বাবু অ
শয় সৌভ্রাত্র ছিলেন, তদীয় সোদর ভ্রাতা শ
চন্দ্র বাবু স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক একখানি অত্যু
কৃষ্ট সন্দর্ভ ইংরাজি ভাষায় রচনা করিয়া মুদ্র
ঙ্কিত করেন, তদ্‌গ্রন্থ খানি তাঁহার নিকট প্রে
হইলে পাঠান্তে আমায় পাঠ করিতে দি
কালে ইহাই ব্যক্ত করেন যে, ভ্রাতঃ দেখি
যেন এ পুস্তক খানি আমায় প্রতিদান করি
তাচ্ছীল্য না হয়, আমার ভ্রাতার এই প্রেম
উপহার, ইহা আমি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিব।

তিনি অনেক দিবস মুরশীদাবাদ জেলায় তাঁহার আশৈশব বন্ধু বাবু তারকনাথ ঘোষের সহিত একত্রে "সরবে ডিপুটিকালেক্টরের" কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা উভয়েই সজ্জন ও কর্ম্ম-দক্ষ লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং বঙ্গ-দেশের "সিবিল সারবিশের" মুখশ্রী স্বরূপ মিশার্শ এলেন্‌জো মনী ও হজসন্ প্রাট্ সাহেব মহোদয় ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের সরবে বিভাগের "সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট" পদে নিযুক্ত হন। তাঁহারা যেমন ঔদার্য্য ও মহত্ব গুণে প্রশংসনীয় ও জনসাধারণের উন্নত্যাকাঙ্ক্ষী এবং প্রকৃত বন্ধু নামে পরিচিত ছিলেন, সেইরূপ তাঁহাদের সৎ-কর্ম্মের সহায়তা ঈশানচন্দ্র ও তারকনাথ এক কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হইয়া সম্পাদন করেন।

ইহার পর তাঁহারা উভয়েই যশোহর জেলার "সরবে" করণার্থ প্রস্থান করিয়া উক্ত জেলায় কতক দিবস অবস্থান করিয়া ছিলেন; তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত মহাশয়ের অকালমৃত্যু হয়, পরোক্ত

বাবু অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া সরকারী কর্ম্ম
করিতেছেন। পুরুষ-প্রধান ঈশানচন্দ্রের অকাল
মৃত্যু যেরূপ অবস্থায় সংঘটিত হয় তাহা শ্রবণ
করিলে পাষাণ তুল্য কঠোর হৃদয়ও বিদীর্ণ
হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ঈশান
বাবু করণীয় সরকারী কর্ম্ম এবম্প্রকারে নির্ব্বাহ
করিতেন যে তৎ প্রতিষেধক কোন কারণই
তিনি গণ্য করিয়া চলিতেন না। ১৮৬১ খৃঃঅব্দের
৮ই মে দিবসে একটি মোকদ্দমার স্থানীয়
তদন্তের প্রয়োজন হওয়ায় নৈমিত্তিক নির্দ্দিষ্ট
স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পালকীতে উদ্দেশ্য প্র-
দেশে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে একটি
বহুজলা অথচ সঙ্কীর্ণপ্রস্থা চমুরুলা নামা স্রোত-
স্বতীর পারোত্তরণের আবশ্যক হয়। শ্রবণ
করিয়াছিলাম পালকীসহ তিনি একখানি তর-
ণীতে আরোহণ করেন, এই সময়ে মেঘাচ্ছন্ন
হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার হয় ও বাত্যা প্রবল
বলসহকারে প্রবাহিত হওয়াতে তরণী খানি

অনুত্তানতারূপে সুগভীর জলগর্ভে মগ্ন হইয়া
যায়। হায়! তিনিও তৎসহ অবিকৃত বল-
বুদ্ধিসহ নিরোগ শরীর লইয়া সেই কাল
স্বরূপ জলরাশিতে অকালে আত্ম সমর্পণ
করেন। তাঁহার এই শোচনীয়ালক্ষিতাকাল
মৃত্যুদর্শনে তত্রত্য ব্যক্তি মাত্রেই হা হতোস্মি
করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে
বিপন্নের ন্যায় স্বীয় স্বীয় গম্যস্থানে গমন
করে। হায়! মানবদেহ কি দুর্ব্বল ও ক্ষণভঙ্গুর!
প্রাতেঃ প্রফুল্ল বদনে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া
রাজকর্ম্মে সমালোচন করে, আবার সন্ধ্যায়
এলোক হইতে প্রস্থান করিয়া এক কালে
সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়। ফলে তত্তুল্য জ্ঞান-
দাতা আর কি আছে যে তাহার অধ্যয়ন
করিয়া নরজাতি দুর্দ্দম্য রিপু সকলের প্রলো-
ভন পন্থা পরিহার করিবে ও প্রকৃত জ্ঞানের
অনুষ্ঠান করিয়া প্রকৃত পথের পথিক হইবে?
ঈশান বাবুর প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী তাঁহার লোক-

লীলা সম্বরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে লোকান্তরিতা হয়েন ; তিনি অবশ্যই ভাগ্যবতী সন্দেহ নাই। দেখ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া পতি-পুত্র-কন্যাগণের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণোত্তর দেহভার ত্যাগ করিয়া কে যাইতে পারে ? সুতরাং ইহাকে অসামান্য পাতিব্রত্য ও ভাগ্যোদয়ের প্রধান ফল স্বরূপ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে।

পিতা মাতার এইরূপ অলক্ষিত ও অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে বিয়োগ সংঘটন হওয়ায় পুত্র কন্যাগণ তাঁহাদের সর্ব্বসুখাভয়প্রদ ক্রোড় দেশ হইতে যুগপৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া দুঃখার্ণবে পতিত হইয়াছিলেন। শ্রুত হইয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্টের এই চির বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্যের সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে জীবন নাশ হইলে পিতৃবিহীন সন্তানগণ কারুণ্যসম্ভব বৃত্তি প্রার্থনা ব্যঞ্জক একখানি আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টে ন্যস্ত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে

কর্ণপাত করেন নাই, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। যাহা হউক তাঁহাদের পিতৃব্য বাবু শশীচন্দ্র দত্ত পুত্র নির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া সুশিক্ষিত করিয়াছেন। এক্ষণে এই মহাজনের জীবন চরিত্রের উপসংহার ভাগে " পিতৃপুণ্যে পুত্রের উদয় " এই মহাবাক্যের সফলতা বর্ণন করিয়া সুখী হইবার কালপ্রাপ্ত হইয়াছি ইহাও সামান্য সুখের বিষয় নহে। ঈশান বাবুর মধ্যম পুত্র বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গদেশের বিশ্ববিদ্যালয়োচিত অধ্যয়ন সমাপ্তির পর অসমসাহসী হইয়া বিদ্যার্থী বেশে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন, তথায় সুস্থ শরীরে কিয়ৎকাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া সিবিল সরবিশ পরীক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি পাঠ করেন। ঈশ্বরানুকম্পাবলে সাধারণ দ্বন্দ্ব পরীক্ষায় কেবল কথঞ্চিৎ উত্তীর্ণ হইয়াছেন এমত নহে, তিনি ভারতভূমির মুখোজ্বল ও ব্রিটিনীয় সহা-

ধ্যায়িগণকে এককালে মলিন মুখ করিয়া দিয়াছেন বলিতে হয়। তাঁহার একি সামান্য সাধন, পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া পাঁচ সহস্র ক্রোশ দূরন্তরিত দেশে গমন পূর্ব্বক শান্তমনে বাস করাই এতদ্দেশের লোকের কঠিন কর্ম্ম; তাহার পর আবার দুরূহ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্য হওয়া যাহার পর নাই কঠিন তাহা কে না স্বীকার করিবে! ঈশান বাবু বিলাত গমনের সুলভ উপায় অবহেলন করেন তাহাই তাঁহার সার্থকজন্মা রমেশচন্দ্র কর্ম্মে পরিণত করিয়া ও দুর্লভপ্রায় রত্নে বিভুষিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, ইহাতে কে না তাঁহার জনক জননীকে ধন্য জ্ঞান করিবে! যাহাদের গর্ভৌরসে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই ধন্য! হায়! ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে তাঁহার জনক জননী রমেশচন্দ্রের গৌরবান্বিত মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিলেন না, হায়,

তাঁহারা জীবিত থাকিলে তন্নিবন্ধন যে সুখের উপলব্ধি করিতেন তাহা আর অন্যে কি বুঝিবে! এবং রমেশচন্দ্রই বা আত্মকৃত ইংলণ্ড প্রবাসের কৃচ্ছ্র সাধনের পরিচয় কাহাকে প্রদান করিয়া তত্তুল্য সুখানুভব করিবেন! ইহা সত্য বটে যে তাঁহার পিতৃব্য ও সোদরগণ তাঁহার আগমনে আহ্লাদিত হইয়া অননুভুত সুখে সুখিত হইবেন, কিন্তু পিতা মাতার সাক্ষাতে তাঁহার প্রত্যাগমনটি যতদূর সর্ব্বসুখময় রূপে দৃষ্ট হইত ততদূর আর কি হইতে পারে? যাহাহউক আমাদিগের এই একমাত্র অভিলাষ যে রমেশ বাবু ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে দীর্ঘ জীবী হউন ও যে রূপ বিদ্যাবলে ভারত ভুমির সম্মান আসমুদ্র পারে বর্দ্ধন করিয়াছেন সেই রূপ মাতৃ ভুমির উত্তর উত্তর শ্রী বৃদ্ধি সম্পাদন করুন।

সমাপ্ত।

হরিশ্চন্দ্র-চরিত।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

মৃজাপুর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ৩৪।১ নং ভবনে

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

বালকদিগের অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং তাহারা যেরূপ দেখে, যেরূপ শুনে ও যেরূপ চরিত্র পাঠ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার অনুকরণে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হয়। এ জন্য ধার্ম্মিক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করা অনুচিকীর্ষু বালকদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। পরন্তু দেশীয় মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত পাঠে যতদূর উপকার হয়, বৈদেশিক ব্যক্তির চরিত পাঠে ততদূর হয় না। এ বিষয় যদিও অনেকে অঙ্গীকার করেন, তথাপি প্রস্তাবে প্রায় কেহই পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেছেন না। আমি এই সমস্ত দেখিয়া এতদ্দেশীয় কতকগুলি মহানুভব ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই এবং যেগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাপাততঃ পরীক্ষার্থ একটী মাত্র প্রচার করিলাম। এই জীবন চরিতটী সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্ম প্রবণতার একটী প্রধান উদাহরণ স্থল। আমি বোধ করি এতৎপাঠে বালকবৃন্দ অনেক পরিমাণে সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রবণ হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়স্থ কতকগুলি বালকের যে চরিত্রগত কিঞ্চিৎ দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ করি, এরূপ জীবন চরিত পাঠ করিলে ও তাহার আনুষঙ্গিক শিক্ষকের নিকট ধর্ম্মনীতির কিঞ্চিৎ

কিঞ্চিৎ উপদেশ পাইলে তাহা সংশোধিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পাঠে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের যাদৃশ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের মহিষীর যেরূপ নির্ম্মল চরিত, স্বামিভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ বর্ণিত আছে, তাহাতে বোধ হয় স্ত্রীগণের পক্ষেও ইহা উপকারী হইতে পারে। যাহা হউক, হরিশ্চন্দ্র চরিত দ্বারা যদি ২। ৪ টী বালক বা বালিকার জ্ঞানলাভ বিষয়ে, ভাষা শিক্ষা বিষয়ে বা চরিত্র সংশোধন বিষয়ে কিছুমাত্র উপকার দেখি, তাহা হইলে কৃতকৃত্যম্মন্য হইয়া অবশিষ্ট জীবন বৃত্তান্ত গুলি ক্রমশঃ বা একত্র করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব ইতি।

২০এ শ্রাবণ ১২৭৫
কলিকাতা
সংস্কৃত বিদ্যালয়

শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

হরিশ্চন্দ্রচরিত।

অতীব প্রাচীন কালে অযোধ্যা নগরীতে হরিশ্চন্দ্র নামে এক অসামান্যগুণসম্পন্ন সূর্য্যবংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার সদৃশ সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতি আর কোথাও দেখা যায় নাই। তিনি সত্য ও ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ধন, মান, যশ, শরীর, সুখ, সৌভাগ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। অধিক কি, ভূমণ্ডলের মধ্যে তাঁহাকেই সাধুতার একমাত্র আদর্শ বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার রাজ্যশাসন কালে কখন দুর্ভিক্ষ বা অকালমৃত্যু উপস্থিত হয় নাই। দিবাকরের উদয়ে যেমন তমোরাশি তিরোহিত হয়,

তাহার ন্যায় তাঁহার অভ্যুদয়সময়ে প্রজ
গণের হৃদয়াকাশ হইতে অধর্ম্মানুরাগ এক
কালে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার অধি
কারে অপহরণ, প্রবঞ্চনা, কূটকারিতা প্রভৃতি
নামমাত্র শেষ হয়। তৎকালে পৌরগণে
মধ্যে প্রায় সকলেই সত্যবাদী, প্রশান্ত, সা
ধার্ম্মিক ও সরলহৃদয় ছিল, কোন ব্যক্তিই ধ
মদে বা তপোমদে গর্ব্বিত ছিল না।

একদা ইন্দ্রের বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহা
সুবিচক্ষণ পুরোহিত উল্কাপাত, অগ্নিবৃষ্টি
রক্তবৃষ্টি, ধূমকেতূদয় প্রভৃতি বিবিধ দুর্নিমি
দর্শনে মহীপতির অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টাপা
আশঙ্কা করিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইলে
এবং কিরূপে পরিণামে তাঁহার কুশল হ
তদ্বিষয়ে অশেষবিধ চিন্তা করিতে লাগি
লেন। পরিশেষে তিনি বিবেচনা করি
শান্তিকর্ম্ম ও স্বস্ত্যয়ন বিধির অনুষ্ঠান কি
লেন, কিন্তু আসন্ন বিপৎপাত শ্রবণে রাজ
পাছে বিষণ্ণমনা হন, এই আশঙ্কায় তাঁহা
নিকট কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

ইতিমধ্যে এক দিবস রাজা হরিশ্চন্দ্র, মৃগয়ার্থ বনগমন করিলেন। তিনি নানাপ্রকার মৃগবধ করিয়া পরিশেষে একটী ভয়ঙ্কর বরাহ দেখিতে পাইলেন। বরাহ রাজাকে দেখিবা-মাত্র নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজাও তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত একাকী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই-লেন। বরাহ কখন লক্ষিত, কখন বা অল-ক্ষিত হইতে লাগিল। রাজা বরাহের অনু-সরণ ক্রমে বহুদূর গমন করিয়া সম্মুখে একটী রমণীয় বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন, কিন্তু বরাহ কোন্ স্থানে তিরোহিত হইল, তাহার আর কিছুমাত্র সন্ধান পাইলেন না। বহু ক্ষণ অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর প্রান্তরের অপর পার্শ্বে এক রমণীয় তপোবন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি সেই তপোবন সন্দর্শনার্থ একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মৃগানুসরণে ক্ষান্ত হই-লেন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব বনশ্রেণী ও নয়নরঞ্জন

প্রান্তরের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন-করি
করিতে শনৈঃশনৈঃ তপোবনাভিমুখে গম
করিতে লাগিলেন। তিনি তপোবনের সন্নি
ধানে উপনীত হইয়াছেন, এমত সময় শরণা
র্থিনী অবলার আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে
প্রবিষ্ট হইল। তিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক
শ্রবণ করিলেন যে, তিনটী ভয়বিহ্বলা অসহায়া
রমণী রোরুদ্যমানা হইয়া কাতর স্বরে সাহায্য
প্রার্থনা করিতেছে ও কহিতেছে, হে আর্য্যগণ!
আপনারা রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমরা
অনাথা অসহায়া অবলা, প্রজ্বলিত হুত হুতা
শনে নিক্ষিপ্ত হইতেছি, রক্ষা করুন, আমা
দিগকে রক্ষা করুন।

রাজা এই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিবামাত্র
করুণার্দ্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ভয় নাই,
ভয় নাই, এই আমি তোমাদিগকে রক্ষা করি-
তেছি, ভয় নাই। তিনি এই রূপে অভয়
প্রদান করিয়া দ্রুতপদে তপোবন মধ্যে প্রবিষ্ট
হইলেন, এবং সেই আর্ত্তনাদ লক্ষ্য করিয়া
বিপন্ন রমণীগণকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে

লাগিলেন। পরিশেষে দেখিতে পাইলেন
যে, এক মহর্ষি অগ্নিশালায় উপবিষ্ট হইয়া
অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন, তিনটী
রমণী কম্পান্বিত কলেবর ও ভয়ব্যাকুলিতা
হইয়া পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে, এই
সময় সর্ব্বসিদ্ধি-বিঘাতক বিঘ্নরাজ মনে মনে
চিন্তা করিলেন, ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন,
বিষ্ণু রক্ষা করিতেছেন, মহেশ্বর প্রলয়কালে
সমুদায় সংহার করিবেন; পরন্তু এই মহর্ষি
বিশ্বামিত্র অপরিসীম তপোবলে সৃষ্টিস্থিতি-
প্রলয় কর্ত্তৃতা রূপ তিন বিদ্যাকেই বশীভূত
করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। বিদ্যাত্রয়ও উপ-
স্থিত হইয়াছে, এখনও ইহার বশীভূত হয়
নাই। এই সময় কোন রূপে এই বিশ্বামিত্রের
বিদ্যাত্রয় সিদ্ধির বিঘ্ন জন্মাইয়া দিই। বিঘ্ন-
রাজ এই রূপ চিন্তা করিয়া মহারাজ হরি-
শ্চন্দ্রের শরীরে আবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর হরিশ্চন্দ্র ক্রোধভরে ভর্ৎসনা
করিয়া কহিলেন, অরে পাষণ্ড নরাধম! তুই

শান্ত দান্ত তপস্বীর বেশ পরিগ্রহ করিয়া তবোপন-বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্? রে দুর্ম্মতে! তোর কিছুমাত্র ঘৃণা বা লজ্জা নাই, তুই নারীবধ করিয়া ঘোরতর মহাপাতক সঞ্চয় করিতেছিস্? রে প্রচ্ছন্ন রাক্ষস! তোর মস্তকে জটাভার, হস্তে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধান বল্কল, অথচ তুই কার্য্যে অতিশয় বীভৎস। আমি রাজা হরিশ্চন্দ্র বিদ্যমান থাকিতে তুই এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবি? আমি এখনই নিশিত শর দ্বারা তোর মস্তক ছেদন করিয়া এই অগ্নিতেই আহুতি প্রদান করিব।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজার ঈদৃশ তিরস্কার ও কটূক্তি শ্রবণ করিয়া এক কালে ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়াতেই বিদ্যাত্রয়-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইল। তখন তিনি উত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, কি. দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র আমার তপস্যা ও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির অন্তরায় হইয়াছে? অরে মূঢ়! তুমি ব্রহ্মাই হও, বা বিষ্ণুই হও, অথবা মহেশ্বরই হও, এখনই তুমি আমার প্রজ্বলিত ক্রো ধাগ্নিতে

দগ্ধ হইবে। অরে ক্ষত্রিয়াধম! মহাদেব ভূতকরুণাময়, শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও ক্রীড়াবলম্বিত সমাধির ভঙ্গ হেতু মদনের কি অবস্থা করিয়াছিলেন, তুমি জান না? অদ্য এই বিশ্বামিত্র ক্রোধাগ্নি দ্বারা তোমাকে সেই রূপ করিবেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঈদৃশ ক্রোধপূর্ণ বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া সভয়ান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! ইনিই সেই ভগবান্ বিশ্বামিত্র! আমি না জানিয়া ইঁহার বিদ্যাত্রয় সিদ্ধির ব্যাঘাত করিলাম! হায়! আমি অসমীক্ষ্যকারিতা নিবন্ধন প্রজ্বলিত অগ্নিতে পদ নিক্ষেপ করিয়াছি! রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার ক্রোধভরে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! তুমি আমার প্রারব্ধ তপস্যার ব্যাঘাত করিয়াছ, এজন্য এই মদীয় দক্ষিণ হস্ত শাপ দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং পূর্ব্ব জাতি বহুকাল পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইলেও এক্ষণে আমার বাম হস্ত তাহা স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্গ্রহণের জন্য ধাবমান হইতেছে।

রাজা এইরূপ ক্রোধপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া
বিশ্বামিত্রের চরণতলে নিপতিত হইলেন ও
বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! ক্ষমা করুন,
ক্ষমা করুন। আমি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ
শুনিয়া বঞ্চিত হইয়াছি, অগ্রে আপনাকে
চিনিতে পারি নাই, ক্ষমা করুন। বিশ্বামিত্র
কহিলেন, কি বলিলে? "অগ্রে আপনাকে
চিনিতে পারি নাই, ক্ষমা করুন।" দুরাত্মন্!
আমি তোমার নিকট পরিচিত নহি তুমি
আমাকে চিন না? আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম
পরিগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াছি,
গর্ব্বিত বশিষ্ঠ-তনয়গণকে ধ্বংস করিয়াছি,
জোর করিয়া সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক
চণ্ডালকে যাগ করাইয়াছি, নূতন স্বর্গ করিতে
উদ্যত হইয়াছি, আমি ত্রিভুবন বিখ্যাত বিশ্বা
মিত্র, আমি তোমার অপরিজ্ঞাত? রাজ
কহিলেন, ভগবন্! আমি যে চিনিতে পারি
নাই বলিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য ওরূপ নহে
আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণ
হইয়াছেন, আপনি তেজঃ ও তপস্যার অদ্বি-

তীয় আধার, আপনাকে না জানে এমত
মনুষ্যই নাই। আমি মোহবশত অগ্রে জানিতে
পারি নাই যে, আপনিই সেই ভগবান্ মহাত্মা
কৌশিক। আমি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে বঞ্চিত
হইয়া রাজধর্ম্মানুসারে তাদৃশ ব্যবহার করিয়া-
ছিলাম, এক্ষণে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি-
তেছি, ক্ষমা করুন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, তুমি
রাজধর্ম্মানুসারে তাদৃশ ব্যবহার করিয়াছ,
তুমি রাজা, তোমাদের ধর্ম্ম কি, শীঘ্র বল।
রাজা কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ
বলিয়াছেন যে, দান করিবেক, রক্ষা করিবেক,
ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেক,
ইহাই রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। বিশ্বামিত্র
কহিলেন, কি বলিলে? "দান করিবেক, রক্ষা
করিবেক, ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত
হইবেক।" আচ্ছা, বল, কাহাকে দান করিবে,
কাহাকে রক্ষা করিবে, কিরূপ ক্ষত্রিয়ের সহিত
সংগ্রাম করিবে? রাজা কহিলেন, ভগবন্!
শ্রবণ করুন। গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান, দুর্ব্বল
ও ভয়ার্ত্ত ব্যক্তিকে রক্ষা এবং শত্রুপক্ষের

সহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! যদি ইহা রাজধর্ম্ম হয় ও যদি তুমি রাজধর্ম্মপালনে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা এই যে, আমি ব্রাহ্মণ, বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে মদীয় বিদ্যা ও তপস্যার অনুরূপ কিঞ্চিৎ দান কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! ভুবনত্রয় দান করিলেও আপনকার বিদ্যা ও তপস্যার অনুরূপ হয় না, কিন্তু তত দূর আমার অধিকার নাই, ইহাতে আমি নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেছি এবং এক্ষণে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, শরীর এই সমুদায়ে অধিকার আছে। ইহার মধ্যে আপনি যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই দান করিতে প্রস্তুত আছি। বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! দানের বিষয় বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ বলিতেছি, তুমি দক্ষিণা কি দিবে, অগ্রে বল।

রাজা কহিলেন, মহর্ষে! অগ্রে দান, পরে দক্ষিণা। আপনি অগ্রে প্রতিগ্রহ করুন, পশ্চাৎ যাহা দক্ষিণা চাহিবেন, তাহাই দিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, তোমার সমুদায় রাজ্য, সমুদায় ধন, সমুদায় ঐশ্বর্য্য, অধিক কি বলিব, তোমার শরীর, পুত্র, ভার্য্যা ও ধর্ম্ম ব্যতীত আর সমুদায়ই আমাকে দান কর। রাজা মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি যদি আমাকে রাজ্য, ধন, সৈন্য প্রভৃতি সর্ব্বস্ব দান করিলে এবং আমিও যদি তাপস হইয়া এতৎ সমুদায় গ্রহণ করিলাম, তাহা হইলে এক্ষণে এই রাজ্যে কাহার প্রভুত্ব থাকিবে? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! যে ক্ষণে আমি পৃথিবী সম্প্রদান করিয়াছি, সেই ক্ষণেই আপনি ইহার অধিকারী হইয়াছেন। অধুনা আপনি পৃথিবীর স্বামী, সুতরাং পৃথিবীতে আপনকার ব্যতীত আর

কাহার প্রভুত্ব থাকিতে পারে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি আমাকে সমুদায় বসুন্ধরা দান করিলে এবং যদি রাজ্যেতে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার হইল, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, তুমি এই ক্ষণেই আমার অধিকৃত স্থান হইতে দূর হও। তোমার অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কার আছে, বোধ হয় উহাতেও আমার স্বত্ব জন্মিয়াছে, সুতরাং উহাও পরি- ত্যাগপূর্ব্বক পত্নী ও পুত্রের সহিত তরুবল্কল পরিধান করিয়া অবিলম্বে গমন কর।

রাজা তথাস্তু বলিয়া মহর্ষির চরণে প্রণি- পাত পূর্ব্বক গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পতিপ্রাণা শৈব্যা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র তৎক্ষ- ণাৎ সমুদায় সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া দাস দাসীর নিকট বিদায় লইলেন এবং একমাত্র স্নেহাস্পদ তনয়কে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

রাজা এই রূপ সর্ব্বস্ব দান করিয়া প্রিয়- তমা পত্নী ও পুত্রের সহিত নির্ব্বাসনার্থ গমন করিতেছেন, এমত সময় উক্ত মহর্ষি বিশ্বা-

মিত্র আসিয়া তাঁহাদের পথ রোধ করিলেন ও কহিলেন, রাজন্! আমাকে অঙ্গীকৃত দক্ষিণা না দিয়া কোথায় যাইতেছ? অগ্রে আমার প্রাপ্য দক্ষিণা দাও, পশ্চাৎ যেখানে ইচ্ছা গমন কর।

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমার সমগ্র রাজ্য আপনাকে দান করিয়াছি, এক্ষণে আমার কিছুই নাই; এই তিনটী দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে; এ অবস্থায় আমি কি রূপে আপনকার প্রার্থনা পূরণ করিতে সমর্থ হই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি যেরূপ অব- স্থাপন্ন হও না কেন, আমাকে অবশ্যই অঙ্গী- কৃত দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। বিশেষত যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালন না করে, সে জন- সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত হয়। কেহ তাহার কথায় বিশ্বাস করে না। বিশেষত ইহাতে সম্পূর্ণ অধর্ম্মও আছে। ইতিপূর্ব্বে তুমিও বলিয়াছ যে, আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিবে, আর্ত্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবে, প্রতিশ্রুত বস্তু দান করিবে, এই সমস্ত রাজ- ধর্ম্ম; ইহা তোমাদের অবশ্য পালনীয়।

হরিশ্চন্দ্র, মহর্ষির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ও চিন্তাকুলিত হইলেন এবং সাতিশয় বিনয়সহকারে কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমি নির্দ্ধন, দেখুন আমার কিছুই নাই; প্রসন্ন হউন; আমার অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল আমাকে অবকাশ প্রদান করুন। আমি কিছুদিনের মধ্যেই আপনকার অভিলাষানুরূপ ধন সংগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আমাকে কত দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে এবং তুমি কি পরিমাণে দান করিবে, শীঘ্র বল, নতুবা এখনই শাপাগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিবে। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, রাজর্ষে! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এক মাস সময় দিউন। এক মাস পরে আমি আপনাকে লক্ষ সুবর্ণ দান করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি যত দিন পরে যে পরিমাণে দক্ষিণা দিবে বলিতেছ, তাহাতে আমি সম্মত আছি; কিন্তু তুমি আমাকে এই পৃথিবী দান করিয়াছ; সুতরাং এই পৃথিবী হইতে অর্থ

সংগ্রহ করিতে পারিবে না, আর যেখানে ইচ্ছা, অর্থ-উপার্জ্জনের চেষ্টা কর। এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রাজার মুখ তৎক্ষণাৎ হিমক্লিষ্ট পঙ্কজের ন্যায় ম্লান হইল এবং পৃথিবী ভিন্ন আর কোথা হইতে কিরূপে ধন সংগ্রহ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, বারাণসী ক্ষেত্র মনুষ্যের অধিকৃত নহে, সেই স্থান শিবেরই অধিকার এবং মহর্ষিরা বলিয়া থাকেন যে, বারাণসী পৃথিবী হইতে ভিন্ন, ইহা পৃথিবীর মধ্যে গণনীয় নহে, অতএব সেই স্থানে গমন করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করি। রাজা হরিশ্চন্দ্র মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! আর বিলম্ব করিবার আবশ্যকতা নাই, শীঘ্র গমন কর, পথে তোমার মঙ্গল হউক্, নির্ব্বিঘ্নে অভিলষিত স্থানে গমন কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ

করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে
বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি অগ্রে এই
মহর্ষির ক্রোধ বজ্রসদৃশ ভয়ঙ্কর বোধ করিয়া
ছিলাম, এক্ষণে ইহা আমার উপর শিরী
কুসুমের ন্যায় কোমল ভাবে পতিত হইল
অনন্তর তিনি প্রফুল্ল হৃদয়ে মহর্ষির চর
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে
কহিলেন, ভগবন্! আপনকার প্রসাদে আমি
দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ
করিলাম, এক্ষণে অনুমতি করুন, সচিবগণকে
আহ্বান পূর্ব্বক প্রতিশ্রুত রাজ্যদানের বিষয়
অব্যাহত ও সুসম্পন্ন করিয়া বারাণসীতে
যাইয়া প্রতিশ্রুত দক্ষিণা সংগ্রহের চেষ্টা করি
তখন বিশ্বামিত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন
অহো! দুরাত্মার কি স্থৈর্য্য! কি মহানুভাবতা!
ঈদৃশ অবস্থাতেও ম্লান বা ধৈর্য্য হইতে বিচ
লিত হইল না!

অনন্তর হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অনু
জ্ঞাত হইয়া রাজ্যভার হইতে অবসর গ্রহ
পূর্ব্বক সচিবগণকে সম্ভাষণ করিয়া পদব্রজে

যাত্রা করিলেন। মহিষীও রাজকুমারকে
ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিতে লাগিলেন।

এই রূপে রাজা, পত্নী ও পুত্রের সহিত
নির্ব্বাসিত হইতেছেন, দেখিয়া পৌরগণ
ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিতে লাগিল ও শোকবিহ্বল হৃদয়ে
বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, হা
নাথ! হা ধার্ম্মিকপ্রবর! আপনি কি নিমিত্ত
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন, আপনি
ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি নিয়ত আমাদের
দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইবে, আপনি ব্যতীত
আর কে আমাদিগের প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ
প্রকাশ করিবে, আপনি যেরূপ সুতনির্ব্বি-
শেষে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আসি-
তেছিলেন, সেরূপ আর কে করিতে পারিবে।
হে রাজেন্দ্র! কৃপা করিয়া মুহূর্ত্ত কাল দণ্ডায়-
মান হউন, আমরা একবার মনের সাধে
আপনকার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া নয়-
নের সার্থকতা সম্পাদন করি। এই মুখচন্দ্র

যে কবে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব, কত দিন পরে যে আমাদের এই অমা নিশার অবসান হইবে, বলিতে পারি না। হায়! যাঁহার যাত্রাকালে শত শত রাজগণ ও অনুযায়ী সৈন্যগণ অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করিত, এক্ষণে কেবল মহিষী তনয়কে ক্রোড়ে লইয়া পদব্রজেই তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। যাত্রাকালে যাঁহার ভৃত্যেরাও হস্ত্যারোহণ পূর্ব্বক গমন করিত, এক্ষণে সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র অনাতপত্র ও অনলঙ্কৃত হইয়া পাদচারেই গমন করিতেছেন।

হা মহারাজ! আপনকার সুকুমার মুখচন্দ্র কি রূপে আতপতাপে পরিক্লিষ্ট ও ধূলিধূসরিত হইবে! হে রাজন্! দয়া করিয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হউন, স্বধর্ম্ম পালন করুন। দয়া প্রকাশই মনুষ্যের বিশেষত রাজার পরম ধর্ম্ম। আমাদের স্ত্রীপুত্র ও ধন ধান্যে কি প্রয়োজন। আমরা সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ছায়ার ন্যায় আপনকার অনুগামী হইব। হা নাথ! হা মহারাজ! হা সত্যব্রত! আপনি কি নিমিত্ত

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন। আপনি যে খানে যাইবেন, আমরাও সেই খানেই যাইব। আপনি যে খানে থাকিবেন, সেই খানেই আমাদের সুখ, আপনি যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, তাহাই আমাদের নগর, তাহাই আমাদের স্বর্গ।

রাজা পৌরগণের এই সমস্ত শোকপরিপূত বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ও পথিমধ্যে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে পৌর বাক্যে আকুলীকৃত হইতে দেখিয়া রোষ ও অমর্ষ ভরে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ ও প্রসারিত করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, রে অনৃতবাদিন্ দুষ্টাচার কুটিলহৃদয়! তোকে ধিক্! তুই আমাকে রাজ্য দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রত্যাহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্? রাজা এই রূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'যাইতেছি' এই মাত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কম্পমান কলেবরে ত্বরান্বিত হইয়া দয়িতার

বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে প্রবৃ
হইলেন।

রাজা, শ্রান্তা ও ক্লান্তা সুকুমারী রা
কুমারীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতেছে
এমত সময়ে দুর্ব্বৃত্ত কুশিকনন্দন ক্রোধভ
অধীর হইয়া দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই রাজমহিষী
সুকোমল অঙ্গে নির্দ্দয়-রূপে প্রহার করি
আরম্ভ করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রাণস
প্রিয়তমা ভার্য্যাকে তাদৃশ প্রহার করি
দেখিয়া দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে বাষ্পগদ্গদ স্বরে কে
'যাইতেছি, যাইতেছি' এই মাত্র কহিলে
আর কিছুই বলিলেন না।

হায়! যে রাজমহিষী সর্ব্বজন পূজনী
ছিলেন, যাঁহার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত শ
সহস্র পরিচারিকা নিয়ত উন্মুখী থাকিত, যি
একবার দৃক্‌পাত করিলে বা কোন সামা
কার্য্য সম্পাদন করিতে আজ্ঞা করিলেও লো
আপনাকে বহুমানাস্পদ বলিয়া বিবেচ
করিত, যাহার শিরীষ কুসুম সদৃশ সুকোম
অঙ্গে পুষ্পকলিকার আঘাত লাগিলেও সক

ব্যথিত হইত, সেই সুকুমারী রাজকুমারী রাজ-
পথে অনাথার ন্যায় অবমানিতা ও তাড়িতা
হইতেছেন! যাঁহার মুখপঙ্কজ ম্লান দেখিলে
রাজার আর দুঃখের পরিসীমা থাকিত না,
তদীয় সেই প্রাণসমা প্রিয়তমা রাজপথের
মধ্যে তাঁহার সম্মুখেই বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক নির্দ্দয়
প্রহারে জর্জ্জরিত হইতেছেন, পৃথিবীর অধীশ্বরী
হইয়াও অনাথার ন্যায় পথে দণ্ডয়মান হইয়া
রোদন করিতেছেন, ইহা দেখিলে পরিতাপ
ও শোকে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হইবে?
হায়! যিনি অট্টালিকোপরি অপূর্ব্ব শয্যায়
শয়ন পূর্ব্বক শত শত সখী কর্ত্তৃক সেবিতা
ও সংবাহ্যমানা হইয়াও ক্লেশানুভব করিতেন,
তিনি এক্ষণে কঠোর বন্ধুর পথে পাদচারে
গমন করিতেছেন, প্রচণ্ড আতপতাপে তাঁহার
মুখচন্দ্র ম্লান হইতেছে, তিনি সর্ব্ব-সম্মানাস্পদ
হওয়াও সর্ব্বসমক্ষে অবমানিতা ও তাড়িতা
হইতেছেন, ইহা দেখিলে কোন্ ব্যক্তির বাষ্প
বিগলিত না হয়?

রাজা হরিশ্চন্দ্র এতক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ও

গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন; কিন্তু ঐক্ষণে
প্রণয়িনীর তাদৃশ অবমাননা ও রোদন দর্শনে
আর অধিক ক্ষণ শোকাশ্রু ধারণ করিতে পারি
লেন না। শিশিরক্লিষ্ট পঙ্কজের ন্যায় তাঁহার মু
পঙ্কজ ম্লান ও অশ্রুপূরিত হইল। কিন্তু তি
তৎক্ষণাৎ শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক মহিষী
হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন
প্রিয়ে! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, আইস আমরা
সত্য পালনে যত্নবান্ হই। সত্যই আমাদের
পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্মই মনুষ্যের ভূষণ। পৃথিবীতে
অশ্ব রথ অট্টালিকা প্রভৃতি যত ঐশ্বর্য্য আছে,
সমুদায়ই কিছু দিনের জন্য; কিছু দিন পরে
অনিচ্ছা পূর্ব্বক সমুদায়ই পরিত্যাগ করিয়া
যাইতে হইবে; কিন্তু ধর্ম্মের সহিত কোন
কালেই আমাদের বিচ্ছেদ নাই। ধর্ম্ম চিরকাল
আমাদের সহচর। যদি অসার অনিত্য বস্তুর
বিনিময়ে সার ও নিত্য বস্তু সংগ্রহ করিতে
পারি, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা সৌভা-
গ্যের বিষয় আর কি আছে। ধর্ম্মের জন্য
সত্যের জন্য শারীরিক কষ্ট সহ্য করাত সামান্য

কথা, যদি ইহার নিমিত্ত শরীরও দান করিতে
হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাতেও প্রফুল্ল
মুখে প্রস্তুত হইব। কারণ শরীর ক্ষণবিধ্বংসী,
ধর্ম্ম আমাদের চিরকালের ধন, চিরকালের
সহায় ও চিরকালের সহচর বন্ধু।

রাজা হরিশ্চন্দ্র এই রূপে পত্নীকে সান্ত্বনা
করিতে করিতে সমভিব্যাহারে লইয়া বিষণ্ণ-
হৃদয়ে শনৈঃশনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন।
সুকুমারী রাজমহিষী কখনই এরূপ পাদচারে
গমন করেন নাই; সুতরাং অযোধ্যা হইতে
বারাণসী গমন করিতে তাঁহাদের প্রায়
এক মাস কাল অতীত হইল। রাজা সমীপবর্ত্তী
বারাণসী তীর্থ অবলোকন করিয়া মনে মনে
বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই পবিত্র স্থান
শিবের অধিকৃত, এখানে মনুষ্যের কোন অধি-
কার নাই। এই স্থান হইতেই অর্থ সংগ্রহ
করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অঙ্গীকৃত দক্ষিণা
প্রদান করিব।

অনন্তর রাজা বারাণসী পুরী প্রবেশ করিতে-
ছেন, এমত সময়ে দেখেন, সম্মুখে বিশ্বামিত্র

উপস্থিত। তখন তিনি শশব্যস্ত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে কহিলেন, মহর্ষে! আমি এক্ষণে আপনাকে অর্ঘ্য প্রদান করি, এমত সংস্থান কিছুই নাই; কিন্তু আমার এই শরীর, এই পুত্র, এই পত্নী উপস্থিত আছে। যদি ইচ্ছা হয়, ইহার মধ্যে যাহাতে অভিরুচি, তাহাই অর্ঘ্য স্বরূপ গ্রহণ করুন, অথবা আমাকে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, কৃপা করিয়া আদেশ করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! অদ্য সেই এক মাস সময় পুর্ণ হইল, আমাকে অঙ্গীকৃত দক্ষিণা প্রদান কর। তুমি রাজ্য ও সর্ব্বস্ব দান-কালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? হরিশ্চন্দ্র বিনয়াবনত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! অদ্যই এক মাস পুর্ণ হইবে সত্য; কিন্তু এক্ষণে বেলা দুই প্রহর, এখনও দুই প্রহর সময় আছে। আপনি অনু-গ্রহ করিয়া অবশিষ্ট দুই প্রহর কাল প্রতীক্ষা করুন, আমি অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করি। বিশ্বা-মিত্র কহিলেন, রাজন্! যাহা বলিতেছ, তাহা-

তেই সম্মত হইলাম। আমি কিঞ্চিৎ পরেই আসিব, পরন্তু অদ্য যদি না দাও, তাহা হইলে তোমাকে শাপ প্রদান করিব। বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন।

রাজা নির্ব্বিণ্নহৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগি-লেন, হায়! অদ্য আমি কি প্রকারে অঙ্গীকৃত দক্ষিণা প্রদান করিব। এক্ষণে আমার ধন কোথায়। এই অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপেই বা ধন সংগ্রহ করিব। প্রতিগ্রহ করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত দূষণীয়, আমি কখনই তাদৃশ নীচ প্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিব না। হায়! এক্ষণে কোথায় যাই, কি করি! বোধ হয় এই-ক্ষণে প্রাণত্যাগ করিলে এ দায় হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে। কি রূপেই বা প্রাণত্যাগ করি, এখন ত আমার জীবন পরিত্যাগ করি-বারও অধিকার নাই কারণ যদি অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান না করিয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে আমি ব্রহ্মস্ব-হৃৎ পাপাত্মার মধ্যে পরিগণিত হ-ইব এবং পরলোকে আমার অধোগতি হইবে। অতএব কাহারো নিকট ধন গ্রহণ করিয়া

তাহার ভৃত্য হইয়া থাকিব। যদি তাহাতেও উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ না হয়, তাহা হইলে আত্ম-বিক্রয় করিয়া অঙ্গীকৃত দক্ষিণা প্রদান করিব।

রাজা অতিশয় কাতর ও ব্যাকুলিত হৃদয় হইয়া অধোমুখে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। এমত সময় পতিপ্রাণা ধর্ম্মপরায়ণা রাজমহিষী বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে ব্যাকুল হইবার সময় নহে, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আপনা সত্য পালনে যত্নবান্ হও। যে ব্যক্তি সত্য হইতে বিচ্যুত হয়, সে শ্মশানকুসুমের ন্যায় অপবিত্র, অনাদরণীয় ও পরিত্যজ্য। মহারাজ! সত্য প্রতিপালন যেমন উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, এ পৃথিবীতে সেরূপ ধর্ম্ম আর কিছুতেই নাই। যিনি সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি বিবিধ যাগই করুন, অধ্যয়নই করুন, দান ধ্যান প্রভৃতি নানা প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেই বা প্রবৃত্ত হউন, সকলই তাঁহার নিষ্ফল। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সত্যই ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের পরিত্রাণের মূল এবং অস-

ত্যই পাপাত্মাদিগের অধোগতির কারণ। পূর্ব্বকালে কৃতি নামক রাজা সপ্ত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি একদা মিথ্যা বাক্য কহাতে স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। মহারাজ! এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ ও পালন কর। সেরূপ করিলে তোমার সত্য অব্যাহত থাকিবে। হৃদয়নাথ! এক্ষণে আমার সন্তান হইয়াছে— এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহিষীর বাক্যরোধ হইল, দুই চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রাজা মহিষীর নয়নজল মার্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, প্রিয়ে! শান্ত হও, পরিতাপ করিও না, রোদন করিও না, পুত্র এই তোমার নিকটেই আছে, তুমি কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ বল। মহিষী কহিলেন, হৃদয়নাথ! এক্ষণে আমার সন্তান হইয়াছে, ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরা সন্তানের নিমিত্তই দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। বিবাহের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা তোমার সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি

আমাকে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান কর। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মোহাভিভূত হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে দুঃখিত হৃদয়ে কহিলেন, প্রিয়ে! ইহা অপেক্ষা পরিতাপ ও কষ্টের বিষয় কি আছে, যে তোমার মুখচন্দ্র হইতে ঈদৃশ বাক্যরূপ বজ্র বিনিঃসৃত হইল। হায়! আমি কি তোমার সেই তাদৃশ প্রেম, তাদৃশ মধুর হাস্য, তাদৃশ মধুর আলাপ সকল বিস্মৃত হইলাম! হায় প্রিয়ে! তুমি কি রূঢ় এরূপ বাক্য বলিতে সমর্থা হইলে। হায়! যাহা মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যাহা বাক্য দ্বারাও বলিতে পারা যায় না, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কি প্রকারে সমর্থ হইব। হা ধিক্ কি কষ্ট! আমি প্রাণসমা, প্রিয়তমাকে সামান্য বস্তুর ন্যায় বিক্রয় পূর্ব্বক ঋণ শোধ করিয়া জীবন ধারণ করিব! রে কঠোর জীবন! তুমি ঈদৃশ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া এখনও স্থির হইয়া আছ! হা বিধাতঃ! যে সুকুমারী রাজমহিষী অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ানা ও শত শত

দাসী কর্ত্তৃক সেব্যমানা হইয়াও ক্লেশ অনুভব করিতেন, তিনি অদ্য আমারই নিমিত্ত অন্যের দাস্য বৃত্তি করিতে অগ্রসর হইতেছেন! রাজা এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

রাজমহিষী শৈব্যা প্রেমাস্পদ প্রিয়বল্লভকে ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও হতচেতন হইতে দেখিয়া শোকবিহ্বল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হা—মহারাজ! হা শৈব্যা-জীবন-সর্ব্বস্ব! তুমি সুকোমল রাঙ্কব শয্যায় শয়নের উপযুক্ত হইয়া কি নিমিত্ত ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছ, কাহা হইতে তোমার তাদৃশ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা হইয়াছে। হায়! যিনি এক সময় ব্রাহ্মণাদিগকে কোটি কোটি মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় অসামান্য বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে সেই দীনজনানুকম্পী মহারাজ, সেই মদীয় হৃদয়বল্লভ ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন! হা বিশ্বামিত্র! তোমার হৃদয়ে কি দয়ার সঞ্চার নাই! আমার হৃদয়বল্লভ হইতে তোমার এমন

কি অনিষ্ট হইয়াছিল যে, তুমি ইঁহাকে এতদূর দুর্দ্দশাপন্ন করিলে। হা বিধাতঃ! তুমি অগ্রে আমাকে তাদৃশ সুখভাগিনী করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত ঈদৃশ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিলে। হা মাতঃ! হা স্নেহময় হৃদয়ে! তোমার পরম স্নেহের ধন শৈব্যার কি দশা হইল, একবার দেখিলে না? হায়! পূর্ব্বে আমার মুখ ম্লান দেখিলে তোমার যে দুঃখের পরিসীমা থাকিত না। হা পিতঃ! তুমি যে শৈব্যার ভাবী শ্রেয়ঃ সাধনের নিমিত্ত বিবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে, যাহাকে জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করিতে, সেই অভাগিনীর এক্ষণে কি দশা হইল, একবার দেখিয়া যাও। হা বিশ্বামিত্র! তোমার মনে কি এই ছিল! তুমি আমার জীবিতেশ্বরকে ঈদৃশ অবস্থায় নিক্ষেপ করিলে, এখনও কি তোমার বৈরনির্য্যাতনের শেষ হয় নাই। হায়! আমার কি কঠিন জীবন! আমি হৃদয়নাথের ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়াও এ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতেছি! রাজমহিষী এইরূপ বিলাপ করিতে

করিতে অসহনীয় দুঃখভরে নিপীড়িতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে নিপতিতা হইলেন।

রাজা ও রাজমহিষী উভয়েই অনাথের ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া আছেন, এমত সময় রাজকুমার রোহিতাশ্ব অত্যন্ত ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সেই জনক জননীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল ও অতিশয় দুঃখভরে কহিতে লাগিল, তাত তাত! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, এই দেখ জিহ্বা শুষ্ক হইতেছে, শীঘ্র আমাকে অন্ন দাও, মাতঃ মাতঃ! উঠ, উঠ, ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়, তুমি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছ। অগ্রে উঠিয়া আমাকে ভোজন করাও। হায়! পিতাও কথা কহেন না, মাতাও কথা কহেন না, ভৃত্যেরাও আসিয়া ভোজন করায় না। মাতঃ মাতঃ! কি নিমিত্ত রাগ করিয়া আছ, আমি ক্ষুধায় আর কথা কহিতে পারি না, আমাকে অন্ন দাও। বালক রোহিতাশ্ব ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই রূপে জননীর

অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, এমত সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইলেন।

বিশ্বামিত্র, রাজা ও মহিষীকে ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া সুশীতল সলিল-দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! উত্থিত হও, উত্থিত হও, আমাকে সেই অঙ্গীকৃত দক্ষিণা প্রদান কর। ঋণ রাখা সাধুলোকের কর্ত্তব্য নহে, কারণ ঋণ থাকিলে দিন দিন দুঃখেরই পরি-বৃদ্ধি হইতে থাকে। রাজা সুশীতল বায়ু ও সলিলদ্বারা চৈতন্য লাভ করিয়া দেখেন, সম্মু-খেই বিশ্বামিত্র। তিনি বিশ্বামিত্রকে দেখিবা-মাত্র পুনর্ব্বার মোহাভিভূত হইলেন। বিশ্বা-মিত্র পুনর্ব্বার তাঁহার মোহাপনয়ন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, তাহা হইলে এই দণ্ডেই আমাকে সেই প্রতিশ্রুত দক্ষিণা প্রদান কর। দেখ, সত্যবলে সূর্য্য উদিত হইতেছে, সত্য-বলে পৃথিবী অবস্থিত রহিয়াছে, সত্যই পরম ধর্ম্ম, সত্যেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সহস্র

অশ্বমেধ এক দিকে ও একটী সত্য এক দিকে, এই উভয় তুলাদণ্ডে ধারণ করিলে সত্যই সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ হয়; অথবা তোর নিকট শান্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া কি হইবে, তুই নিতান্ত ক্রূর, মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা ও নীচাশয়। তুই মিথ্যা মৃদু বাক্য দ্বারা আমাকে প্রবঞ্চনা করিতে অভিসন্ধি করিয়াছিস্। এখনও পুনর্ব্বার তোকে বলি-তেছি, শ্রবণ কর, অদ্য সন্ধ্যার মধ্যে যদি দক্ষিণা না পাই। তাহা হইলে সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই তোকে শাপ প্রদান করিব। মহর্ষি এই কথা বলিয়াই ক্রোধভরে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তখন রাজা অতিশয় ভয়াতুর ও একেবারে ইতিকর্ত্তব্যতা-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি-লেন। তিনি নির্ব্বিণ্ণ ও দুঃখাভিসন্তপ্ত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি নিতান্ত অধম, নিতান্ত হতভাগ্য, এক্ষণে আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বভাবাপন্ন হইয়া নৃশংস উত্তমর্ণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতেছি, কি করি; হায়! এক্ষণে আমার জীবন পরিত্যাগেও স্বাধীনতা নাই।

আমি যদি প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান না করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করি, তাহা হইলে পরলোকে আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। এক্ষণে প্রায় এক প্রহর বেলা আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বা কি রূপে তাদৃশ অধিক অর্থ সংগ্রহ করিব? অথবা এক্ষণে চিন্তার সময় নাই, সূর্য্যাস্তগমনের মধ্যে আপনাকে বিক্রয় করিয়া মহর্ষির ঋণ পরিশোধ করি।

মহিষী কহিলেন, নাথ! এমন কর্ম্ম করিও না, তুমি স্বয়ং বিক্রীত ও দাসরূপে বদ্ধ হইলে কে তোমাকে মুক্ত করিবে? এরূপ করিলে আমাদের পুনর্ম্মিলনের আর সম্ভাবনা থাকিবে না। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমাকে দাসীরূপে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও। তুমি স্বাধীন থাকিলে ক্রমশঃ অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে মুক্ত করিতে পারিবে। নাথ! এক্ষণে আর বিচারের সময় নাই। এ অধীনীর অনুরোধ রক্ষা কর, সকল দিক বজায় থাকিবে। মহারাজ! আর ভাবিও না, বেলা নাই, সন্ধ্যার মধ্যে অর্থসংগ্রহ না

হইলে ব্রহ্মশাপে এখনই সর্ব্বনাশ হইবে, এখনই শাপানলে সকলকেই ভস্মীভূত হইতে হইবে। নাথ! আর বিলম্ব করিও না, গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে বিক্রয়ার্থ পণ্যবীথিকায় লইয়া চল।

রাজা বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে কহিলেন। প্রিয়ে! ঈদৃশ বিষয়ে বাক্য বলিতে যদি আমার জিহ্বা সমর্থা হয়, তাহা হইলে, অতি নৃশংস ব্যক্তিরাও যে কার্য্য করিতে না পারে, এই নির্ঘৃণ নরাধম আমি সেই কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইতেছি। চল পণ্যবীথিকায় গমন করি। অনন্তর রাজা ধর্ম্মপত্নীকে পণ্যবীথিকায় লইয়া গিয়া শোকবিহ্বল হৃদয়ে বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, অহে নগরবাসিগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর। "আমি কে? জিজ্ঞাসা করিতেছ?, আমি নৃশংস অমানুষ রাক্ষস ও অতিশয় কঠিনহৃদয়। আমার সদৃশ পাপাত্মা নির্দ্দয় আর কেহই নাই; কারণ আমি প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী বিক্রয় করিতে আসিয়াও জীবন ধারণ করিতেছি। এক্ষণে বলিতেছি, আমার প্রাণসমা প্রিয়তমাকে যদি কেহ

দাসীরূপে ক্রয় করিতে ইচ্ছা কর। তাহা হইলে আমার প্রাণ বিয়োগ না হইতে হইতেই শীঘ্র বল। এক জন নাগরিক কহিল, তোমার স্ত্রী অত্যন্ত কোমলাঙ্গী, এ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবে না। পরে অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইহার মূল্য কত? রাজা কহিলেন, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। নাগরিক কহিল, ইহার এত অধিক মূল্য হইতে পারে না।

রাজা অন্য স্থানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, অহে নগরবাসিগণ! শ্রবণ কর। আমি প্রাণসমা প্রিয়তমাকে বিক্রয় করিতে আসিয়াছি, যদি কাহারো দাসীর প্রয়োজন হয়, শীঘ্র বল। এক জন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পত্নী কি কর্ম্ম করিতে পারিবে? মূল্যই বা কত? শৈব্যা কহিলেন, পরপুরুষসেবা ও পরোচ্ছিষ্ট ভোজন ব্যতিরেকে আর সকল কর্ম্মই আমি করিতে পারিব। রাজা কহিলেন, মূল্য এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। ক্রেতা কহিল, এত মূল্য হইতে পারে না, আর একটা দর বল। রাজা কহিলেন, আমি

ক্ষত্রিয়জাতি, দ্বিতীয় দর বলিতে জানি না। আর এক জন ক্রেতা আসিয়া কহিল, বোধ হয়, তোমার স্ত্রী কোন কর্ম্ম কার্য্য করিতে জানে না, অথবা অসচ্চরিত্রা হইবে। নতুবা তুমি কি নিমিত্ত ইহাকে বিক্রয় করিতে আনিয়াছ। এই রূপ নানা কথা বলিয়া উপস্থিত ক্রেতাগণ চলিয়া গেল।

এই সময় এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশীধামে বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী অল্পবয়স্কা ও অতিশয় সুকুমারী। এজন্য সুচারু রূপে গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ ভৃত্যের প্রতি অনুমতি করেন যে, কোন্ স্থানে দাসী ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তুমি অনুসন্ধান করিয়া আইস। ভৃত্য অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিলে তিনি অনল্প ধন সমভিব্যাহারে লইয়া যষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার সহিত পণ্যবীথিকায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দারবিক্রয়ে উন্মুখ দেখিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, পণ্যজীবিন্! আমি এই

দাসীকে ক্রয় করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমার পত্নী আমার অত্যন্ত প্রিয়তমা ও সাতিশয় কোমলাঙ্গী। তিনি যথারীতি গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন না। এজন্য একটী সুশীলা দাসীর আবশ্যক। তদীয় ভার্য্যার যেরূপ বয়ঃক্রম, যেরূপ শীলতা ও যেরূপ কার্য্যদক্ষতা, তদনুরূপ ভূরি পরিমাণ ধন আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। তুমি তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে দাসীরূপে বিক্রয় কর।

ব্রাহ্মণ এই বাক্য বলিবামাত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইল। তাঁহার অন্তঃকরণ অসহনীয় সন্তাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি এক কালে ইতিকর্ত্তব্যতা জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলেন, কিছুই আর উত্তর দিতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণ রাজার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার উত্তরীয় বল্কল আকর্ষণ পুরঃসর তাহাতে পঞ্চাশৎ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা বন্ধন করিয়া দিলেন এবং মহিষীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক গমন

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বালক রোহিতাশ্ব স্বীয় জননীর কেশাকর্ষণ ও তাদৃশ অভূতপূর্ব্ব অবমাননা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে দৃঢ়রূপে অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, কোন মতেই ছাড়িয়া দিলেন না।

রাজমহিষী একান্ত কাতরা হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, আর্য্য! ক্ষণ কাল মাত্র আমাকে ছাড়িয়া দিউন, আমি জন্মের মত একবার প্রাণাধিক প্রিয় তনয়ের মুখপঙ্কজ নিরীক্ষণ করিয়া লইব ও ইহাকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিয়া রাখিয়া যাইব; পিতঃ! আমি জীবন কালের মধ্যে যে পুনর্ব্বার এই কুমারের সুকুমার মুখ-চন্দ্র দেখিতে পাইব, এরূপ সম্ভাবনা আর দেখি না। অনন্তর তিনি সতৃষ্ণনয়নে রোহিতাশ্বের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাতর বচনে কহিলেন, বৎস! আমি রাজপুত্রী ও রাজমহিষী হইয়াও এক্ষণে ভাগ্য বিপর্য্যয় হেতু পরাধীনা ও দাসী হইয়াছি। আমি অধুনা অপবিত্রা ও তোমাদিগের অস্পৃশ্যা, তুমি পবিত্র বংশ-

সম্ভূত রাজকুমার হইয়া এ পাপীয়সীকে আর স্পর্শ করিও না।

নৃপপত্নীর এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার তাঁহার কেশ আকর্ষণ করিয়া ভবনাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। রাজনন্দন রোহিতাশ্ব সহসা কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক জননীকে লইয়া যাইতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং পুনর্ব্বার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রেতা ব্রাহ্মণ অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া সেই শিশু রাজকুমারকে বল পূর্ব্বক পদাঘাত করিলেন। রাজকুমার তথাপি জননীকে ছাড়িয়া দিলেন না, প্রত্যুত দৃঢ়রূপে অঞ্চল ধরিয়া 'মা, মা' বলিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজমহিষী অশ্রুপূর্ণ লোচনে ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাতর বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! প্রসন্ন হউন, কৃপা করিয়া এই বালক-

টীকেও ক্রয় করুন। আমি আপনার ক্রীতা দাসী হইয়াছি বটে, কিন্তু এই বালক সমীপবর্ত্তী না থাকিলে কোন ক্রমেই সুচারুরূপে কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আর্য্য! হতভাগ্যা দাসীর প্রতি প্রসন্ন হউন, কৃপা করুন, আমি পয়স্বিনী গাভীর ন্যায়, আমাকে বৎসের সহিত বিয়োজিত করিবেন না। ব্রাহ্মণ অগত্যা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কহিলেন, ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা শ্রেণীবিশেষে দাস দাসীর যে পরিমাণে মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন, তদনুসারে আমি সার্দ্ধ পঞ্চবিংশতি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া বালককে বিক্রয় কর। ব্রাহ্মণ এই বাক্য বলিয়া আর পঞ্চবিংশতি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা রাজা হরিশ্চন্দ্রের উত্তরীয় বল্কলে বন্ধন করিয়া দিলেন এবং বালককে ধরিয়া তাহার জননীর সহিত এক রজ্জুতে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া চলিলেন। রাজা, পত্নী ও পুত্রকে তাদৃশ বলপূর্ব্বক নীত হইতে দেখিয়া সাশ্রু লোচনে দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হায়! পূর্ব্বে যে রাজনন্দিনী

অপর লোকের দৃষ্টিপথের অতিথি হন নাই, চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত যাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না, অদ্য তিনি দাস্য বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমার সমক্ষেই অনাথার ন্যায় সাধারণ পথে গমন করিতেছেন। সূর্য্যবংশ প্রসূত বালক আমা কর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া দাস রূপে নীত হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমি এখন ও জীবন ধারণ করিতেছি! রে পাষাণ হৃদয়! এখনও তুমি শতধা বিদীর্ণ হইলে না! হতবিধে! তুমি কি কেবল দুঃখের চরম সীমা অনুভব করাইবার নিমিত্ত এই হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্রে চৈতন্যাধান করিয়াছ? হা প্রিয়ে! হা হরিশ্চন্দ্রময়-জীবিতে! হা সৌজন্যনিধে! হা লাবণ্যময়ি! হা প্রেমনিলয়ে! হা হরিশ্চন্দ্র প্রিয়সখি! হা রমণীরত্নভূতে! হা জীবিতেশ্বরি! হা সস্মিত মধুরভাষিণি! ধার্ম্মিক ভূষণভূতি! হা রাজকার্য্য পর্য্যালোচন প্রিয়সহচরি! হা প্রিয়শিষ্যে! হা স্নেহময়ি! অসমীক্ষ্যকারী হরিশ্চন্দ্রের দুর্ণয় নিবন্ধনই তুমি এতদূর দুর্দ্দশাসাগরে ঝম্প প্রদান করিলে! তুমি অগ্রে না বুঝিয়া চন্দনবৃক্ষ ভ্রমে

বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছ—দারবিক্রয়ী পাষণ্ডের হস্তে শরীর মন সমুদায় সমর্পণ করিয়াছ! হা সূর্য্যবংশ-প্রসূত সুকুমার রাজকুমার! তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই যে তোমার নৃশংস পিতা ধনের নিমিত্ত তোমাকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছে! হা পুত্র! তুমি কি নিমিত্ত এই অপত্যবিক্রয়ী দুরাচারের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলে! রে কঠোর প্রাণ! তোকে ধিক্! তুই কি অভিপ্রায়ে এ পর্য্যন্ত এ দেহ আশ্রয় করিয়া আছিস্!

রাজা এই রূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময়, মহর্ষি বিশ্বামিত্র আসিয়া সমীপবর্ত্তী হইলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহার চরণ সন্নিধানে সমর্পণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বিশ্বামিত্র গণনা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দক্ষিণা অসম্পূর্ণ হইয়াছে, তখনও পঞ্চবিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রার ন্যূনতা আছে সুতরাং তিনি এক কালে কোপে প্রজ্বলিত হইলেন। তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত ও

ঘূর্ণিত হইল। তিনি ক্রোধভরে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া কহিলেন, রে ক্ষত্রবন্ধো! রে মিথ্যাবাদিন্! রে দুরাচার পাপিষ্ঠ নরাধম! তুমি ইহাই কি আমার উপযুক্ত দক্ষিণা বিবেচনা করিলে? ইহা দ্বারাই কি তোমার অঙ্গীকার পালন করা হইল? এই কি তোমার সত্যনিষ্ঠার পরিচয়? রে দুর্ব্বৃত্ত! তুমি মিথ্যা মধুর বাক্য দ্বারা তপস্বী ব্রাহ্মণকে প্রতারণা করিতে অভিসন্ধি করিয়াছ? তুমি এপর্য্যন্ত আমাকে জানিতে পার নাই? রে প্রবঞ্চক এখনই তোমার দুরভিসন্ধির প্রতিফল দিতেছি রে দুষ্ট প্রতারক! আমি যে কঠোর তপস্যা করিয়াছি, আমার যে নির্ম্মল ব্রাহ্মণত্ব, আমার যে বিশুদ্ধ অধ্যয়ন, আমার যে উগ্র প্রভাব এখনই তাহার অনুরূপ বল দেখ।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সভয়ান্তঃকরণে মহর্ষির চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, ভগবন্! অবশিষ্ট চতুর্থাংশ ধন প্রদান করিব, কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ কাল প্রতীক্ষা

করুন। এক্ষণে আমার কিছুই নাই, পত্নী ও বালক পুত্রকে বিক্রয় করিয়া এই ধন সংগ্রহ করিয়াছি। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রাজা হরিশ্চন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল, তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র কহিলেন; এক্ষণে বেলা অবসান হইয়াছে। আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিব। অতঃপর আর কোন কথাই শুনিব না। আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি, তুমি অতঃপর আর দ্বিরুক্তি করিও না। অতঃপর আর তোমার অনুরোধ রক্ষা হইবে না। বিশ্বামিত্র রাজাকে এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াই সেই সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিহ্বল হইয়া একেবারে হতচেতন ও ইতিকর্ত্তব্যতা শূন্য হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি কি করেন, কি রূপেই বা মহর্ষির ঋণজাল হইতে মুক্ত হন, কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি শোকাভি-

ভূত হইয়া বার বার আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অনন্যগতি হইয়া, আপনাকে বিক্রয় করিয়া সত্য প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন।

অনন্তর তিনি মস্তকে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক বণিগ্ বীথীতে দণ্ডায়মান হইয়া পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, সাধুগণ! আমি কোন কার্য্যের নিমিত্ত গত্যন্তর না দেখিয়া আত্মবিক্রয় করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, যদি কাহারো দাসের প্রয়োজন হয়, সূর্য্যাস্ত গমনের মধ্যেই আমাকে ক্রয় কর। যৎকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র এইরূপে আত্ম-বিক্রয়ের ঘোষণা করেন, তখন অনেক ক্রেতা সে স্থলে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ক্রয় করিতে অগ্রসর হইল না। তখন তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে পুনঃপুন ঘোষণা করিতেছেন এমত সময় এক জন বিকৃতাকার বিকৃতবেশ চণ্ডাল একটী কুক্কুর সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তির মুখ দীর্ঘ ও

শ্মশ্রুল, উদর স্থূল, শরীর কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ ও দুর্গন্ধি, নেত্রদ্বয় পিঙ্গল বর্ণ, বাক্য কঠোর ও নীরস, গলদেশ শব মাল্যে বিভূষিত। এই চণ্ডাল ঘোষণাস্থলে উপস্থিত হইয়াই হরিশ্চন্দ্রের প্রতি রুক্ষ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, অরে! আমি তোকে কিনিব, মূল্য কত বল্। রাজা কহিলেন, আপনি কি আমাকে ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন? চণ্ডাল কহিল হাঁ আমি তোকে কিনিব। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? চণ্ডাল উত্তর করিল আমি এই নগরীতে সকল মশানের অধিপতি, আমি সর্ব্বত্র বিখ্যাত, আমার নাম প্রবীর, আমি বধ্য ব্যক্তিকে বধ করিয়া থাকি ও হত ব্যক্তির কম্বলাদি আমারই প্রাপ্য। রাজা কহিলেন, চণ্ডালের দাসত্ব ইহকাল ও পরকালে নিন্দিত, পাপজনক ও জাতি ভ্রংশ কর, অতএব যদি আমি শাপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হই, তাহাও ভাল, তথাপি চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিতে পারিব না। রাজা এই কথা বলিতেছেন, এমত-

সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি রোষ ও অমর্ষভরে রাজার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এই চণ্ডাল তোমাকে প্রার্থনাধিক ধন দিতে প্রস্তুত আছে, অতএব তুমি কিনিমিত্ত এখনও আমার সম্পূর্ণ দক্ষিণা প্রদান করিতেছ না? রাজা কহিলেন, ভগবন্! আমি সূর্য্য বংশীয় বলিয়া আমার একটী অভিমান আছে, অতএব আমি কিরূপে ধনার্থী হইয়া চণ্ডালের নিকট আত্ম সমর্পণ করি। যাহাতে ইহলোকে অযশ ও পরকালে নরক গমন করিতে হইবে, এরূপ ঘৃণিত কার্য্যে কি রূপে প্রবৃত্ত হই।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি তুমি চণ্ডালের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া এই মুহূর্ত্তেই আমার প্রাপ্য দক্ষিণা প্রদান না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে শাপাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিব। রাজা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এক কালে হতচেতন হইলেন এবং মনোদুঃখে কাতর ও বিহ্বল হইয়া মহর্ষির চরণ তলে নিপতিত হইয়া কহিলেন,

ভগবন্! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন্, ক্ষমা করুন; আমি তোমার দাস, তোমারি ভক্ত; আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি—অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করা অতীব কষ্টকর; আমাকে চণ্ডালের দাসত্বে নিক্ষিপ্ত করিবেন না। মহাত্মন্! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, কৃপা করুন, দয়া করুন। আপনার প্রাপ্য অবশিষ্ট ধন দ্বারা আমি আপনকারই চিন্তানুবর্ত্তী, একান্ত বশংবদ ও সর্ব্বকর্ম্মকর কিঙ্কর হইয়া থাকিব, আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন। আমাকে চণ্ডাল হস্তে সমর্পণ করিবেন না। মহাত্মন্! চণ্ডালের দাস হওয়া সাতিশয় ক্লেশকর, এরূপ কেহ কখন হয় নাই। আমাকে চণ্ডাল হস্তে সমর্পণ করিবেন না। মহর্ষে! আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন, আমি চণ্ডালের দাস হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, দূর মূর্খ! আমি তপস্বী, আমি দাস লইয়া কি করিব। রাজা কহিলেন, আপনি যখন যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তখন

তাহাই সম্পন্ন করিব। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার দাস হইলে যাহা আজ্ঞা করিব, তাহাই পালন করিবে? রাজা কহিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, যদি তাহা অসাধ্য না হয়, অবশ্যই সম্পন্ন করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভাল, এক্ষণে তুমি আমার দাস হইলে; আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি যে, এই উপস্থিত চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া আমার অবশিষ্ট দক্ষিণা সমুদায় প্রদান কর। রাজা বিষণ্ণ বদনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই করিতেছি। পরে তিনি চণ্ডালের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, ভদ্র! আমার একটী নিয়ম আছে, তদনুসারে আমাকে ক্রয় কর। চণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিয়ম কিরূপ? রাজা কহিলেন, আমি তোমার ভবনে থাকিব না, অন্তরে বাস করিব, রথ্যা হইতে ছিন্ন বসন কুড়াইয়া পরিব, তোমার অন্ন গ্রহণ করিব না, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। এতদ্ব্যতীত তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে,

তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিব। চণ্ডাল এই নিয়মেই সম্মত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বহুসংখ্য সুবর্ণ প্রদান করিল।

রাজা ধন গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে এক্ষণে আমাকে ব্রহ্মশাপে দগ্ধ বা সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় নাই, অথচ ঋণ হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইলাম, অতএব এ অবস্থায় চণ্ডালের দাসত্বও আমার পক্ষে শ্লাঘ্যতর বোধ হইতেছে। অনন্তর তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট সমুদায় ধন অর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! দক্ষিণা প্রদানে কালবিলম্ব হওয়াতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, কৃপা করিয়া তাহা ক্ষমা করুন। বিশ্বামিত্র লজ্জিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজা চণ্ডালের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, স্বামিন্! এক্ষণে আমি আপনকার দাস, আমাকে কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। চণ্ডাল কহিল, এক্ষণে তুই আমার গৃহে চল্, পরে দক্ষিণ মশানে

মৃতচৌরহারী হইয়া দিবারাত্রি তোকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া চণ্ডালের সহিত তদীয় আলয়ে গমন করিলেন।

সে দিবস রাজাকে অগত্যা চণ্ডালগৃহেই অবস্থিতি করিতে হইল। পর দিবস প্রত্যূষেই চণ্ডালাধিপতির অনুমতিক্রমে দুই জন চণ্ডাল তাঁহাকে লইয়া দক্ষিণ শ্মশানে রাখিতে চলিল। রাজা বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমার দুঃখ পরম্পরা ক্রমশই দারুণ হইয়া উঠিতেছে। একে ত আমি চণ্ডালের দাস হইলাম, তাহাতে আবার ঘোর বীভৎস মহাশ্মশানে বাস করিতে হইবে এবং মৃত ব্যক্তির বস্ত্র গ্রহণ করা কর্ম্মটীও সামান্য ঘৃণিত নহে। হায়! আমি কি হতভাগ্য! আমার প্রজারা আমি ভিন্ন আর কাহাকেই জানে না, এক্ষণে তাহারা অনাথ হইয়াছে বলিয়া কি আমি তাহাদের নিমিত্ত শোকাভিভূত হইব? অধুনা আমার প্রাণসমা প্রিয়তমা পত্নী ব্রাহ্মণ গৃহে দাসী ও প্রাণাধিক

সুকুমার রাজকুমার দাস হইয়া কাল যাপন করিতেছে বলিয়া কি দুঃখ প্রকাশ করিব? অথবা আমি স্বয়ং চাণ্ডালের দাস হইলাম বলিয়া কি স্বীয় অদৃষ্টের উপর ধিক্কার প্রদান করিতে থাকিব, হায়! যে সময় আমি পত্নী ও পুত্রকে সামান্য দ্রব্যের ন্যায় বিক্রয় করিলাম, সেই সময় ব্রাহ্মণশিষ্য বৎস রোহিতাশ্বকে পদাঘাত করিয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিলে সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। আহা! যখনি আমার সেই দিন মনে হয়, তখনি যেন অন্তঃকরণ শল্যবিদ্ধ হইতে থাকে। হায় দেবি! তুমি নির্ম্মল চন্দ্রবংশে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সূর্য্যবংশীয় ভূপতির বধূ হইয়াছ, কিন্তু যদি এই দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্রের হস্তে পতিত না হইতে, তাহা হইলে ঈদৃশ দুরপনেয় দুঃখপরম্পরা তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিত না। হায় দেবি! পূর্ব্বে নবমালিকা কুসুম লইয়া মালা গাঁথিতেও তোমার মহাক্লেশ বোধ হইত, কিন্তু এক্ষণে তুমি কি প্রকারে অনভ্যস্ত পরিচারিকার কর্ম্ম করিতেছ?

রাজা বিষণ্ণ হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দক্ষিণ শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন, শ্মশান সাতিশয় ভীষণ ও বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে। কোথাও শিবাগণ শব ভক্ষণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া অশিব ধ্বনি করিতেছে; কোথাও চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে ও মহাশব্দ করিয়া নরমুণ্ড স্ফুটিত হইতেছে; কোথাও কোন তরক্ষু, অর্দ্ধদগ্ধ মৃত শরীরের একাংশমাত্র মুখে করিয়া পলায়ন করিতেছে; কোথাও শত শত গৃধ্র মাংস ভক্ষণার্থ শবের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া বসাতে দূর হইতে ইতস্তত বিকীর্ণ প্রস্তর রাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; কোথাও পেচকগণ কোটর হইতে মুখ বাহির করিয়া ডাকিতেছে; কোথাও গৃধ্রগণ আকাশে পক্ষ বিতত ও স্থির করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ পূর্ব্বক শবোপরি নিপতিত হইতেছে; কোথাও শ্মশানবাসিনী ভগবতীর ভগ্ন মন্দির শুষ্ক নির্ম্মাল্যসমূহে ও নরমুণ্ডমালায় শোভা পাইতেছে।

এই মহাশ্মশান মধ্যস্থিত উচ্চতম তরুকোটরে চণ্ডকাত্যায়নীর পূজা হইত। চণ্ডালদ্বয় সেই দেবীর নিকট সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। রাজাও অবনত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক দেবীর বীভৎস পূজোপচার অবলোকন করিলেন। অনুচর চণ্ডালদ্বয় কহিল, অরে দাস! আমাদের প্রভুর আদেশ এই যে, এই মশানে তোকে দিবারাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে এবং প্রত্যেক শবের কম্বলাদি গ্রহণ করিয়া প্রভুর নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। রাজা তথাস্তু বলিয়া চণ্ডালপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন, চণ্ডালদ্বয়ও যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

পৃথিবীর একাধিপতি মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এক্ষণে মৃত কম্বলহারী হইয়া মহাশ্মশানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যখন শ্মশানভূমি নিস্তব্ধ দেখেন, তখন একান্তে বসিয়া স্বীয় অবস্থা আদ্যোপান্ত স্মরণ করেন ও তৎকালে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দর দর করিয়া জলধারা নিপতিত হইতে থাকে। যখন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর দাসীভাব স্মৃতিপথে উদিত

হয়, তখন তিনি এককালে হতচেতন হইয়া পড়েন। আবার যখন তাঁহার অনুভব হয় যে, শ্মশানে কোন মনুষ্যের সমাগম হইয়াছে, তখনই সমুদায় শোক পরিহার পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রভুর আজ্ঞা ঘোষণা করেন ও কহেন, শ্মশানে কে উপস্থিত হইয়াছ, শ্রবণ কর। আমার প্রভু এই শ্মশানের অধিপতি, তাঁহার আজ্ঞা এই যে, আমাকে না জানাইয়া এবং মৃত ব্যক্তির কম্বলাদি না দিয়া কোন ব্যক্তি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে পারিবে না।

রাজা দিবারাত্রি শ্মশানে থাকিয়া এইরূপ ঘোষণাদি দ্বারা মৃত কম্বলাদি সংগ্রহ করিয়া প্রভুর নিকট সমর্পণ করেন এবং শ্মশানে প্রত্যাগমন কালে সমীপস্থ দুই চারি গৃহে জীবন ধারণের উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা করিয়া গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক আহারে প্রবৃত্ত হন। এই আহারীয় দ্রব্য এত অল্প যে, তদ্দ্বারা তাঁহার জীবন রক্ষামাত্র হইত, ক্ষুধানিবৃত্তি হইত না; কারণ তিনি যদি এক গৃহে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান

করিয়া দ্বিতীয় গৃহে আর আতিথ্য স্বীকার করিতেন না, এক ভবনে এক মুষ্টির অধিক ভিক্ষা লইতেও সম্মত হইতেন না। যখন শ্মশানে কেহ শব লইয়া উপস্থিত হইত, তখন তিনি বীতশোকের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক মৃত-কম্বলাদি গ্রহণ করিতেন। সে সময় পুটপাকের ন্যায় তাঁহার শোকাগ্নি হৃদয়-মধ্যে এরূপ আবৃত থাকিত যে, কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে শোকসন্তপ্ত বলিয়া অনুভব করিতে পারিত না। আবার শ্মশানভূমি জনশূন্য হইলেই তিনি কখন মহিষীর নিমিত্ত, কখন প্রাণসম পুত্রের নিমিত্ত, কখন আপনার দুরপনেয় দাসভাবের নিমিত্ত, কখন অনুরক্ত প্রজাগণের নিমিত্ত, ও কখন বা অনুরক্ত মন্ত্রিবর্গের নিমিত্ত শোকাকুল ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

একদা নিশীথ সময়ে রাজা স্বীয় দুরপনেয় দুরবস্থা চিন্তাপূর্ব্বক শোক সাগরে মগ্ন আছেন, এমত সময় এক জন যোগী পুরুষ আসিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং আশীর্ব্বাদ

পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! আমি আপনকার নিকট কিছু প্রার্থনা করি। রাজা প্রার্থনার নাম শুনিয়াই লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। যোগী কহিলেন, মহারাজ! লজ্জিত হইবেন না, আমি যোগবল দ্বারা আপনকার অবস্থা সকলই জানিতেছি। এক্ষণে আপনকার যাহা সাধ্য, তাহাই প্রার্থনা করিব। অদ্য নিশীথ সময়ে আমি এই শ্মশানে কোন যোগ সিদ্ধ করিবার মানস করিয়াছি। আপনকার নিকট প্রার্থনা এই যে, যাহাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, আপনি যত্নবান্ হইয়া তাহা করুন। রাজা কহিলেন, আপনি যোগ বলে সকলি জানিতেছেন। আমি দাস হইয়া প্রভুকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিরূপে আপনকার অভিমত কার্য্য করিতে পারিব? যোগী কহিলেন, আপনকার প্রভুর কোন কার্য্য হানি হইবে না। আপনি এই স্থানে থাকিয়াই বিঘ্ন দূর করিতে যত্নবান্ থাকিবেন, তাহা হইলেই আমার যোগ সিদ্ধি হইবে। রাজা স্বীকার

করিলেন যে, আমি প্রভুকার্য্যের অবিরোধে আপনকার অভিপ্রেত কার্য্য করিতে পারি। যোগী তথাস্তু বলিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া যোগ করিতে লাগিলেন, রাজাও যাহাতে যোগসাধনের কোন ব্যাঘাত না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত প্রায় হইলে যোগী যোগ সাধনানন্তর অসঙ্খ্য ধন লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন মহারাজ! আপনকার গুণে আমার যোগসিদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে আপনাকে এই কোটি কোটি সুবর্ণ প্রদান করিতেছি। আপনি ইহাদ্বারা আপনাকে ও স্ত্রীপুত্রকে উদ্ধার করুন। রাজা কহিলেন, যোগিন্! আমি দাস, আমার উপার্জ্জিত ধনে আমার অধিকার নাই, প্রভুরই অধিকার। অতএব আমি কিরূপে ইহা স্বয়ং গ্রহণ করি। পরন্তু প্রভুর নিমিত্ত ইহা পরিত্যাগ করিতেও পারি না, অতএব আমার প্রার্থনা, এই ধন আমার প্রভুর নিকট পৌঁছিয়া দিউন্, তাহা হইলেই আমার গ্রহণ করা

হইল। যোগী রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন ও মনে মনে ভাবিলেন, মহাত্মা হরিশ্চন্দ্রের সদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। অনন্তর যোগী রাজা হরিশ্চন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে সেই সমুদায় ধন চণ্ডালপতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র এই রূপে হৃতকম্বলহারী হইয়া সেই মহাশ্মশানে বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী ব্রাহ্মণগৃহে দাসী হইয়া থাকেন। তিনি সমস্ত দিন নিয়মিত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সায়ংকালে একবার মাত্র কেবল এক জনের জীবন ধারণোপযোগী যৎসামান্য অন্ন কিঞ্চিন্মাত্র দেন। হরিশ্চন্দ্রমহিষী সেই অন্ন বিভাগ করিয়া কিঞ্চিৎ পুত্রকে দিয়া কিঞ্চিৎ স্বয়ং ভোজন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করেন।

আহা! যে শৈব্যা সসাগরা ধরার অধীশ্বরী ছিলেন, যাঁহার অনন্যসুলভ আহার

সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য শত শত পাচিকা নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে তিনি যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্যও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান না। যে রাজমহিষী অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক সখীগণ কর্ত্তৃক সেবিতা হইয়াও ক্লেশানুভব করিতেন, এক্ষণে তিনি ভূমিতে তৃণ বিস্তীর্ণ করিয়া প্রিয়তম কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রা যান। এ সমুদায় দেখিলে কাহার না হৃদয় দুঃখে প্লাবিত হয়।

এক দিন শৈব্যা করতলে কপোলদেশ বিন্যাস পূর্ব্বক সজল নয়নে চিন্তা করিতেছেন যে, হায়! আমার তুল্য দুঃখিনী ও হতভাগ্যা আর পৃথিবীতে কেহই নাই। আমার রাজ্য; ঐশ্বর্য্য, দাস দাসী, বন্ধু বান্ধব সকলই গিয়াছে, তাহাতে আমি কিছুমাত্র কাতর হই নাই; পরন্তু আমি যে ভর্ত্তৃসেবায় বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাতে অনবরত আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। এ হতভাগিনীর মৃত্যু নাই! এক্ষণে আমার স্বামী কোথায় আছেন, কি করিতেছেন! তিনি কি আমাকে উদ্ধার

করিতে চেষ্টা পাইতেছেন না? তিনি কি আমাকে এক কালে ভুলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন? হায়! আমি কি আর সে সহাস্য বদন দেখিতে পাইব? আর কি আমি স্বামির চরণকমল সেবায় অধিকারিণী হইব। হা নাথ! তুমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর; তোমার ভাগ্যে এতদূর দুরবস্থা ছিল! ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই মিথ্যা! এই কি ধার্ম্মিকের পুরস্কার! এই কি সত্যনিষ্ঠার চরম ফল! হা মহারাজ! তোমার ভাগ্যে এত দূর দুরবস্থা ঘটিবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর।

শৈব্যা এই রূপ চিন্তা করিতেছেন ও তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, এমত সময় রোহিতাশ্ব ফলমূল প্রভৃতি কতকগুলি সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য হস্তে করিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে তথায় উপস্থিত হইল এবং কহিল, মা! এই দেখ, আমি কেমন খাদ্য সামগ্রী আনিয়াছি। শৈব্যা অঞ্চল দ্বারা নয়ন জল মুছিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা! তুমি দুঃখিনীর সন্তান, তোমাকে দয়া

করিয়া এ সমুদায় কে দিয়াছেন? রোহিতাশ্ব কহিল, মা! আমি ব্রাহ্মণদিগকে পুষ্পাদি চয়ন করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহারা প্রীত হইয়া এই সমস্ত দেবতার প্রসাদ আমাকে আহার করিতে দিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তুমি প্রতিদিন প্রত্যূষে পুষ্প বিল্বপত্র প্রভৃতি চয়ন করিয়া আনিবে, আমরাও তোমাকে প্রতিদিন দেবতার প্রসাদ কিছু কিছু দিব। শৈব্যা সন্তুষ্ট হইয়া সেই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী রোহিতাশ্বকে আহার করাইলেন। রোহিতাশ্ব আহারান্তে জননীর গলা ধরিয়া কহিল, মা! আমি এমন উপাদেয় দ্রব্য ত কখন খাই নাই। মা! আমি প্রতিদিন প্রত্যূষে ফুল তুলিতে যাইব, অনুমতি কর। শৈব্যা পুত্রের প্রর্থনায় সম্মতা হইলেন, রোহিতাশ্বও প্রতিদিন ফুল তুলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দিতে লাগিল।

এক দিন রজনীর তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে শৈব্যা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ভূমিশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন, এমত

সময় স্বপ্ন দেখিলেন যে, রোহিতাশ্ব বিল্বপত্র তুলিতে তুলিতে একটী কাল সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শৈব্যা এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং পুত্রকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক তাহার মঙ্গলের জন্য দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের উদ্বেগ শান্তি হইল না।

অনন্তর রজনীর অবসান হইল। চতুর্দ্দিকে পক্ষিগণ কোলাহল করিতে লাগিল। রোহিতাশ্ব উত্থিত হইয়া মাতার নিকট পুষ্পচয়নার্থ বনগমনে অনুমতি প্রার্থনা করিল। শৈব্যা কহিলেন, বৎস! অদ্য আমি তোমাকে পুষ্পচয়নার্থ যাইতে দিব না। আমি অতিশয় অমঙ্গল স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি অতি হতভাগিনী। আমার আত্মীয় স্বজন সকলই গিয়াছে, স্বামির চরণ দর্শনেও বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে বাছা! কেবল তোমার মুখ দেখিয়াই পৃথিবীতে আছি। আমার মনে কেমন অমঙ্গল শঙ্কা হইতেছে। বোধ হই-

তেছে যেন, অদ্য তোমাকে ছাড়িয়া দিলে আর পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব না। বাছা! আজ্ আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, বরঞ্চ আমি যাইয়া পুষ্প চয়ন করিয়া দিতেছি। রোহিতাশ্ব কোন মতেই জননীর কথা শুনিল না, প্রত্যুত হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

অনন্তর রোহিতাশ্ব পুষ্পচয়নার্থ গমন করিলে ক্রমে ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। রোহিতাশ্বের প্রত্যাগমনের সময় উত্তীর্ণ হইল; তথাপি সে ফিরিয়া আসিল না। তখন শৈব্যা অনিষ্ট শঙ্কা করিয়া রোদন করিতে করিতে উন্মাদিনীর ন্যায় রোহিতাশ্বকে ডাকিতে ডাকিতে কাননাভিমুখে ধাবমানা হইলেন। অনেক অন্বেষণের পর দেখেন, কাননের অভ্যন্তরে বিল্বমূলে রোহিতাশ্বের মৃতদেহ ধরণীতে বিলুণ্ঠিত রহিয়াছে।

শৈব্যা তনয়ের মৃতদেহ দেখিবামাত্র বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে চৈতন্য

লাভ করিয়া মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন ও কহিতে লাগিলেন, হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি রাজকন্যা ও রাজমহিষী হইয়া পৃথিবীর সমুদায় সুখে বঞ্চিত হইয়াছি; আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য দাস দাসী অট্টালিকা সমুদায়ই গিয়াছে, স্ত্রী জাতির জীবিত-সর্ব্বস্ব পতিরত্ন দর্শনেও বঞ্চিত হইয়া আছি, এক্ষণে যে একমাত্র তনয়ের মুখকমল দর্শন করিয়া সমুদায় দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতেছিলাম, অদ্য বিধাতা তাহাও হরণ করিলেন! রে! হত জীবন! আর কি আশয়ে এ দেহে অবস্থিতি করিতেছ; তুমি, সমুদায় ছায়াবৃক্ষ উন্মূলিত হইতে দেখিয়াও ভবিষ্যতে ছায়ার আশয়ে যে একটী সূক্ষ্ম অঙ্কুরের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া ছিলে, অদ্য সেই তোমার আশার ধন, তোমার অবলম্বন অঙ্কুরটীও নষ্ট হইল!! হায়! আমার আশালতা এত দিনের পর সমূলে সমুন্মূলিত হইল! হা নাথ! তুমি কোথায় আছ! আজি তোমার জীবনাধিক

পুত্রের অবস্থা এক বার অবলোকন কর! তুমি আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলে যে, পুত্রকে যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবে; কিন্তু আমি এরূপ হতভাগিনী যে, তোমার আজ্ঞা পালন করা দূরে থাকুক্, পুত্রটীকেও হারাইলাম। হা বিশ্বামিত্র! এত দিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। শৈব্যা এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন।

শৈব্যা মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া এই রূপে সমস্ত দিন বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ও তৎপুত্রকে দেখিতে না পাইয়া শিষ্যগণের সহিত চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, পরিশেষে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিতে পাইলেন। শৈব্যা ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র রোদন করিতে করিতে হায়! পিতঃ! আমার কি হইল! বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন, আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ অনেক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মা!

অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। আমার বিল্বপত্র তুলিতে আসিয়া সর্পাঘাতে তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তুমি চিরকাল রোদন করিলেও ইহাকে আর পুনর্ব্বার পাইবে না; পরন্তু আমার যতদূর ক্ষমতা, আমি তাহা করিতেছি। অদ্যাবধি আমি তোমাকে দাসীভাব হইতে মোচন করিলাম। এক্ষণে তুমি স্বাধীনতা লাভ করিয়া পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধানানন্তর স্বামীর নিকট গমন কর; শৈব্যা কহিলেন, পিতঃ! যদি আপনি আমাকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে তাহার মূল্য স্বরূপ আমার এই হস্তের সুবর্ণ কঙ্কণ গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলিয়া কঙ্কণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

শৈব্যা মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মৃত কম্বল গ্রহণার্থ সেই স্থানে গমন

করিলেন। শৈব্যা বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি হতভাগিনী! ক্ষণকালের মধ্যে বিধাতা আমাকে রাজ্য ঐশ্বর্য্য দাস দাসী আত্মীয় স্বজন সমুদায় হইতে বিশ্লিষ্ট করিলেন! ভর্ত্তৃসেবাতেও বঞ্চিত হইলাম, যে একমাত্র তনয়ের মুখপানে চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলাম, অদ্য তাহাও হারাইলাম। সিদ্ধ পুরুষেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমার এই পুত্র পৃথিবীর সম্রাট্ হইবে, কিন্তু আমার ভাগ্যে সিদ্ধ পুরুষের বাক্যও মিথ্যা হইল! ভগবন্ কৌশিক! আমার স্বামী তোমার নিকট এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন যে, কিছুতেই তোমার ক্রোধ শান্তি হইল না।

অনন্তর হরিশ্চন্দ্র ক্রমশ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই মহিষী মৃত পুত্র লইয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহার শোক সাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে হতজ্ঞান ও মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া ভূতলে

অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। আমার বিল্বপত্র তুলিতে আসিয়া সর্পাঘাতে তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তুমি চিরকাল রোদন করিলেও ইহাকে আর পুনর্ব্বার পাইবে না; পরন্তু আমার যতদূর ক্ষমতা, আমি তাহা করিতেছি। অদ্যাবধি আমি তোমাকে দাসীভাব হইতে মোচন করিলাম। এক্ষণে তুমি স্বাধীনতা লাভ করিয়া পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধানানন্তর স্বামীর নিকট গমন কর; শৈব্যা কহিলেন, পিতঃ! যদি আপনি আমাকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে তাহার মূল্য স্বরূপ আমার এই হস্তের সুবর্ণ কঙ্কণ গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলিয়া কঙ্কণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

শৈব্যা মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মৃত কম্বল গ্রহণার্থ সেই স্থানে গমন

করিলেন। শৈব্যা বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি হতভাগিনী! ক্ষণকালের মধ্যে বিধাতা আমাকে রাজ্য ঐশ্বর্য্য দাস দাসী আত্মীয় স্বজন সমুদায় হইতে বিশ্লিষ্ট করিলেন! ভর্ত্তৃসেবাতেও বঞ্চিত হইলাম, যে একমাত্র তনয়ের মুখপানে চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলাম, অদ্য তাহাও হারাইলাম। সিদ্ধ পুরুষেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমার এই পুত্র পৃথিবীর সম্রাট্ হইবে, কিন্তু আমার ভাগ্যে সিদ্ধ পুরুষের বাক্যও মিথ্যা হইল! ভগবন্ কৌশিক! আমার স্বামী তোমার নিকট এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন যে, কিছুতেই তোমার ক্রোধ শান্তি হইল না।

অনন্তর হরিশ্চন্দ্র ক্রমশ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই মহিষী মৃত পুত্র লইয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহার শোক সাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে হতজ্ঞান ও মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া ভূতলে

পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া আপনার উপর পুনঃপুন ধিক্কার দিয়া শোকাকুলিত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি এই দেখিবার জন্য এত দিন জীবন ধারণ করিয়া আছি! আমা হইতে কি সূর্য্য বংশের অবসান হইল! হায়! আমি পূর্ব্ব জন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে, বিধাতা আমাকে এতদূর ক্লেশপরম্পরা ও অপার শোকসাগরে নিঃক্ষেপ করিলেন। হায়! বিধাতা আমাকে রাজ্যচ্যুত ও চণ্ডালের দাস করিয়াও কি ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না! দুঃখের চরম সীমা ভোগ করিবার জন্যই কি হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল! রাজা হরিশ্চন্দ্র এই কথা বলিতে বলিতে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি। আত্মপ্রকাশ করিয়া কি দেবীর সান্ত্বনা করিব? অথবা আমি যে চণ্ডালের দাস ও জাতিভ্রষ্ট হইয়াছি, তাহা ত দেবী জানেন না, এক্ষণে সে বিষয় জানাইয়া দুঃখের উপর দুঃখ দেওয়া উচিত নয়; অতএব

এক্ষণে রীতিমত ধর্ম্মানুসারে প্রভুর আদেশ পালন করি।

অনন্তর তিনি কিঞ্চিৎ অন্তরালে দাঁড়াইয়া বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, আমার প্রভুর আজ্ঞা আছে যে, আমাকে না জানাইয়া ও মৃতকম্বলাদি না দিয়া কোন ব্যক্তি শ্মশানোচিত ক্রিয়া করিতে পারিবে না। শৈব্যা কহিলেন, ভদ্র! তুমি নিকটে আসিও না; অন্তরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্য সমুদায় দিতেছি। রাজা মৌনভাবে মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। শৈব্যা রোহিতাশ্বের গাত্র হইতে বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, ভদ্র! গ্রহণ কর। রাজা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দাও বলিয়া কর প্রসারণ করিলেন। শৈব্যা তাঁহার হস্ত পদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক চিরপরিচিতের ন্যায় দেখিয়া সন্দিহানা হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে চিনিতে পারিয়া হা নাথ! এ কি বলিয়া ভূতলে পতিতা হইলেন।

রাজা সজল নয়নে কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে বিক্রয় করিয়া মহর্ষির অর্দ্ধ ঋণ পরিশোধ করিলাম। শেষে অবশিষ্ট ঋণ শোধের জন্য চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে হইল। এক্ষণে আমি চণ্ডালের দাস ও পতিত হইয়াছি। আমি এক্ষণে অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিয়া তোমার পবিত্র শরীর অপবিত্র করিও না। শৈব্যা কহিলেন, নাথ! ধর্ম্মের গতি অনুভব করিলাম, সত্যনিষ্ঠার চরম ফল দেখিলাম, আর আমার জীবন ধারণে ইচ্ছা নাই। তুমি কৃপা করিয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক সেই চিতাতেই আত্মশরীর ভস্মসাৎ করিব। রাজা কহিলেন, দেবি! আমি আর কি সুখে জীবন ধারণ করিব। আইস, আমরা দুই জনে আনন্দ পূর্ব্বক এক চিতায় প্রাণত্যাগ করিয়া সমুদায় দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাই।

অনন্তর রাজা ও মহিষী উভয়েই চিতা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। চিতা প্রস্তুত হইলে তাঁহারা

গঙ্গাস্নান করিয়া চিতায় অগ্নি প্রদান করিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ হইল। রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন শুনিয়া অসংখ্য লোক দুঃখিতান্তঃকরণে সেই স্থানে আগমন করিল। দৈবগত্যা মহর্ষি বিশ্বামিত্রও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, মহারাজ! জীবনত্যাগ করিবেন না, আমি আপনকার সত্যনিষ্ঠায় সাতিশয় প্রীত হইয়াছি এবং বুঝিয়াছি যে, আপনকার সদৃশ সত্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ভূলোকে নাই। আমি আপনকার পুত্রের জীবন প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র সর্পদষ্ট রোহিতাশ্বের বিষাপনয়ন পূর্ব্বক জীবন প্রদান করিলেন। পরে তিনি হরিশ্চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা তপস্বী, আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন। আমি কেবল আপনকার সত্যনিষ্ঠার পরীক্ষা করিবার জন্য এতদূর ক্লেশ দিয়াছি। এক্ষণে আপনকার দত্ত রাজ্য আপনকার পুত্রকে দান করিলাম।

রাজা হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আপনি কুমার রোহিতাশ্বকে বাঁচাইয়া রাজ্য প্রদান করিলেন, অতঃপর আর আমার আনন্দের বিষয় কি আছে। এক্ষণে আপনি প্রীত মনে অনুমতি প্রদান করুন, আমি সস্ত্রীক হইয়া আপনকার সমক্ষে এই কাশীধামে জীবন বিসর্জ্জন করি। জীবন ত্যাগের ঈদৃশ উত্তম স্থান ও উত্তম সময় আর পাইব না। অনন্তর বিশ্বামিত্র সম্মতি প্রদান করিলে রাজা মহিষীর সহিত একত্র হইয়া প্রজ্বলিত চিতায় নিপতিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক, ধৈর্য্যশালী ও সত্যনিষ্ঠ ভূপতি আর কখন জন্মে নাই। অনন্তর পরমধার্ম্মিক হরিশ্চন্দ্রের স্মরণার্থ সেই শ্মশানে একটী প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইল। স্কন্দ পুরাণ কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি কাশী দর্শন করিতে যাইবেন, পরম ধার্ম্মিক রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করা তাঁহার আবশ্যক। মুসলমান-

দিগের ভারতবর্ষাধিকারের পূর্ব্বে কাশীতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি একটী প্রধান দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে পরিগণিত ছিল। অনন্তর সেই মূর্ত্তি কি রূপে নষ্ট হইল, তাহা অনুমান করা নিতান্ত কঠিন নহে। দুর্দ্দাণ্ড যবনদিগের হস্তে পড়িয়া অন্যান্য অসংখ্য দেবমূর্ত্তির যে অবস্থা হইয়াছিল, হরিশ্চন্দ্রের মূর্ত্তিরও সে অবস্থা ঘটিবার অসম্ভাবনা কি?

রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ ভূপতি আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সত্যকেই পৃথিবী মধ্যে সার পদার্থ ও অবশ্য অবলম্বনীয় বিবেচনা করিতেন। তিনি সত্য রক্ষার জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র ও পৃথিবীর সুখসামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন, পরিশেষে অতি হীন জাতি চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। সত্য যে কিরূপ অমূল্য-রত্ন, তাহা আমাদের হরিশ্চন্দ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এতদূর ধর্ম্মভীরু ছিলেন যে; তাঁহার একমাত্র তনয়ের অন্ত্যেষ্টি

ক্রিয়ার জন্য তাঁহার মহিষী শ্মশানে আসি-লও প্রভুর জন্য মৃত-কম্বল গ্রহণে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি যে রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমুদায় ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-পাদপের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক একমাত্র সত্যরত্ন লইয়া পরমসুখে শ্মশানে থাকিতেন, সেই সুখ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অজ্ঞেয় ও দুর্ল্লভ। তিনি এক সময় বলিয়া-ছিলেন যে, যখন আমাকে সত্য হইতে বিচলিত হইতে হয় নাই, তখন আমার পক্ষে চণ্ডালের দাসত্বও শ্লাঘ্য। যাহা হউক, হরি-শ্চন্দ্র যেরূপ সত্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার মহিষীও তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। হরিশ্চন্দ্র-পত্নী এরূপ পতিব্রতা ছিলেন যে, স্বামীর সত্য রক্ষার নিমিত্ত আত্ম-বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ হরি-শ্চন্দ্র ও তৎপত্নীর সদৃশ সত্যপরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ দম্পতি অতি বিরল।